# ছোটদের অর্থনীতি

নীহারকুমার সরকার

পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৪১

২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, বুক কনসার্নের সহযোগিতায়
২২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড হইতে
সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬, তাপসী প্রিণ্টার্সে লীলা ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

# সূচীপত্র

[ এক ]

## অর্থনীতির অর্থ কি ?

**অর্থনীতি শাস্ত্রটা** তোমাদের অনেকের কাছেই হয়ত অজানা। কিন্তু অর্থনীতি যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সে সব বিষয় তোমাদের মোটেই অজানা নয়। কারণ সেগুলো না হ'লে আমরা বাঁচতেই পারি না, ভাল ভাবে বাঁচাত দূরের কথা। আমাদের বেঁচে থাকতে হ'লে, নানান রকম জিনিস পত্রের প্রয়োজন। খাবার-দাবার, বাড়ী ঘর দোর, পোষাক পরিচ্ছদ এগুলো না হ'লে ত বেঁচে থাকাই অসম্ভব। তারপর গান, বাজনা, বই, সিনেমা ইত্যাদি একটু স্থখে বেঁচে থাকতে গেলে দরকার হয়। এমনি ধারা সারাক্ষণ নানা রকম জিনিসের অভাব আমরা বোধ করি এবং সেসব অভাব মেটাবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করি। মানুষ যত সভ্য হয়, তার এইসব জিনিস-পত্রের অভাববোধ তত বেড়ে যায় এবং তার পক্ষে তত বেশী জিনিস-পত্রের দরকার হয়। কিন্তু আমরা সভ্যতার যে স্তরেই থাকি না কেন, কিছু না কিছু জিনিসের দরকার আমাদের হবেই হবে এবং এই জিনিস-পত্রের অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা চেষ্টা করব। লক্ষ্য কর, এই অভাব

মেটাবার জন্য যে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরী হয় তাকেই বলে **উৎপাদন**।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় ছিল, তখন তারা বনের পশু শিকার ক'রে ও গাছের ফলমূল জোগাড় ক'রে খেয়ে বাঁচত। শিকারের উদ্দেশ্যে তারা তীর ধনুক তৈরী করত, পাথরের টুকরো ধারাল ক'রে নিত এবং তাই নিয়ে নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিস পত্র তৈরী করত। মাংস, ফল-মূল ছিল তাদের ক্ষুধার অভাব মেটাবার সামগ্রী এবং এগুলো তারা নিজেরাই পরিশ্রম ক'রে তৈরী ক'রে নিত। তেমনি আবার আজকাল সভ্য জগতে চাষ-বাস ক'রে ধান, চাল, গম, তূলো, পাট ইত্যাদি, খনি থেকে লোহা, কয়লা ইত্যাদি এবং কলকারখানায় কলকব্জা খাটিয়ে কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। খনি, মাঠ ও কারখানায় উৎপন্ন এইসব নানা রকম জিনিসের সাহায্যে আমাদের অভাব মেটে। অসভ্য আমলে মানুষদের সামান্য কয়েকটা জিনিস উৎপাদন করলেই চল্‌ত, আর আজকাল সভ্য মানুষের অনেক কিছু উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু সভ্য বল, আর অসভ্যই বল, কোন মানুষেরই উৎপাদন ছাড়া বেঁচে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। মানুষ সভ্যতার যে স্তরেই থাকুক না কেন, যে সমাজেই বাস করুক না কেন, যে কোন দেশের অধিবাসী আর যে জাতিরই হোক না কেন, উৎপাদন ছাড়া মানুষ কোন অবস্থাতেই বাঁচতে পারে না।

কিন্তু এই প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র উৎপাদন বিভিন্ন ভাবে হ'তে পারে। মানুষের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব, মানুষ এক এক অবস্থায় এবং এক এক যুগে এক এক রকম উপায়ে জিনিস-পত্র উৎপাদন ক'রেছে এবং তা নিজেদের ভেতর ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়ে নিজেদের অভাব মিটিয়েছে। জিনিস-পত্র তৈরীর নিয়ম ও তা ভাগ বাঁটোয়ারা করার নিয়মকে বলে **উৎপাদন প্রণালী**।

এই উৎপাদন প্রণালীতে কে কি অংশ নেয় তার উপরে মানুষের পরস্পরের ভেতর একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। একে বলে **উৎপাদন সম্বন্ধ**। যেমন, যদি কেউ কারখানায় মজুরের কাজ করে, তবে উৎপাদন প্রণালীতে সে মজুরের অংশ গ্রহণ করল এবং এর ফলে কল মালিকের সঙ্গে, অন্যান্য মজুরের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, দোকানদারদের সঙ্গে, চাষীদের সঙ্গে, জমিদারদের সঙ্গে, এই রকম সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তার একটা বিশেষ সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেল। উৎপাদন প্রণালী যেমন যুগে যুগে বদলে যায়, তেমনি উৎপাদন সম্বন্ধও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। এর ফলে উৎপাদনের কাজে কে কি অংশ নেবে এবং উৎপাদিত জিনিস-পত্রের কতটা কে পাবে তার নিয়মও বদলে যায়। যেমন মধ্যযুগে জমিদারদের সঙ্গে চাষীদের এক রকম সম্বন্ধ ছিল। জমিদার চাষীদের উৎপাদনের একটা অংশ দখল করে নিত ও নিজে তা ভোগ করত এবং চাষীদের দিয়ে নিজের খাস জমিতে বেগার খাটাত। এই ছিল জমিদারদের সঙ্গে

চাষীদের উৎপাদন সম্বন্ধ। আজকাল সে সম্বন্ধ বদলে যাচ্ছে। আজকাল চাষীরা দেনার দায়ে ও খাজনার দায়ে জমি বিক্রি ক'রে ফেলতে বাধ্য হ'চ্ছে। ফলে কারখানায় যেমন মজুরেরা কাজ করে মাইনে নিয়ে, তেমনি জমিতেও মাইনে পেয়ে কিংবা ভাগ-চাষী হিসাবে চাষীরা চাষ করছে। পুঁজিবাদী যুগেই এই হ'ল জমিদার ও চাষীর সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধ।

অর্থনীতির কাজ হ'চ্ছে, প্রথমত বিভিন্ন যুগের উৎপাদন প্রণালী ও মানুষের উৎপাদন সম্বন্ধ কি ছিল বা কি আছে তা আবিষ্কার করা। দ্বিতীয়ত, এই উৎপাদন প্রণালী ও উৎপাদন সম্বন্ধ কি কি কারণে বদলে যায় এবং এক উৎপাদন প্রণালী নষ্ট হ'য়ে গিয়ে তার জায়গায় আর এক উৎপাদন প্রণালী কেন স্থাপিত হয় তা আবিষ্কার করা এবং তৃতীয়ত. বর্তমানে যে উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত আছে তার গতি কোন দিকে তার ইঙ্গিত দেওয়া।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, যদিও অর্থনীতি অতি সাধারণ জিনিস-পত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করে কিন্তু এর সিদ্ধান্তগুলো খুব সহজ নয় এবং হেলার বস্তুও নয়। কারণ উৎপাদন প্রণালীর উপর কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে এবং উৎপাদন প্রণালীতে গলদ দেখা দিলে কোটি কোটি লোকের কষ্ট পেতে হয়। আসলে বর্তমান সমাজে যে সব সমস্যা দেখতে পাও, যেমন বেকার সমস্যা, ব্যবসা সঙ্কট, যুদ্ধ, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি এর প্রায় অধিকাংশ সমস্যাই উৎপাদন প্রণালীর গলদের

জন্য হ'য়ে থাকে। অর্থনীতি যদিও তোমাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে প'ড়লে, এই সব সমস্যাগুলোর মূল কারণ সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা ক'রতে পারবে।

[ দুই ]

## উৎপাদন প্রণালী

উৎপাদন প্রণালীগুলোকে মোটামুটি ভাবে দুরকম ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম **স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী**; দ্বিতীয় **পণ্য উৎপাদন প্রণালী**। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীতে জিনিস-পত্র কেনা বেচা থাকে না, বা খুব সামান্য রকম থাকে। লোকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে না। নিজেরা ভোগ করার উদ্দেশ্যেই সব কিছু তৈরী ক'রে থাকে। যেমন মনে কর, গ্রামের লোকেরা যদি তাদের যা কিছু দরকার—কাপড় চোপড়, ধান চাল, লাঙ্গল ইত্যাদি সব কিছু নিজেরাই তৈরী ক'রে নেয়, তবে তাকে বলব স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী ( Natural Productive System ). স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে **বিনিময়ের** অর্থাৎ কেনা বেচার অভাব। যদিও কেনা বেচা হয়, তা হ'লেও তা কতকটা আকস্মিক গোছের।

কারও হয়ত কিছু হঠাৎ বাড়তি তৈরি হয়ে গেছে, সে সেটা ঐ রকম হঠাৎ বাড়তি যার বা যাদের অন্য কিছু আছে তাদের সঙ্গে অদল বদল করে। যদিও বা কেনা বেচা নিয়মিত হয়, তা হলেও তার পরিমাণ সমাজের মোট উৎপাদনের তুলনায় খুব কম। এখানে ভোগের জন্য সোজাসুজি উৎপাদনই হ'চ্ছে সাধারণ নিয়ম। যেমন—

**অভাব**
**|**
**উৎপাদন**
**|**
**অভাবপূরণ বা ব্যবহার**

পণ্য উৎপাদন প্রণালী কিন্তু ঠিক এর উল্টো। উৎপাদন হয় এখানে প্রধানত বিনিময়ের জন্য। যে যা কিছু তৈরী করুক সে তা বাজারে এনে হাজির করে বিক্রির জন্য এবং তার উৎপাদিত জিনিস বিক্রি ক'রে তার যা দরকার তাই সে কিনে নেয়। যেমন একজন তাঁতী, তার চালের দরকার। তখন সে কাপড় তৈরী করে এবং বাজারে কাপড় বিক্রি ক'রে চাল কেনে। শ্রমিকের কাপড় দরকার, তার সম্বল শুধু শ্রমশক্তি; সে তাই বিক্রি করে এবং তাতে যা পায়, তাই দিয়ে সে কাপড় কেনে। এরকম সমাজেও অবশ্য কিছু কিছু জিনিস ভোগের জন্য সোজাসুজি ভাবে তৈরী হ'তে পারে। যেমন তোমার কলমদানিটা হয়ত তুমি নিজে তৈরী ক'রে নিতে পার। কিন্তু সমাজের মোট যত কিছু জিনিস উৎপাদিত হয় তার তুলনায়

এগুলো খুব সামান্য। বেশীর ভাগ জিনিস-পত্রই বিক্রির জন্য তৈরী হয়। এখানকার নিয়ম হচ্ছে—

**অভাব**
|
**উৎপাদন**
|
**বিনিময়**
|
**অভাবপূরণ বা ব্যবহার**

বিনিময় হ'ল পণ্য উৎপাদন প্রণালীর প্রধান লক্ষণ এবং বিনিময়ের জন্য জিনিস-পত্র তৈরী হয় ব'লে এগুলোকে বলা হয় পণ্য অর্থাৎ যা দোকানে কেনা বেচা হয় তাকে পণ্য বলে। জিনিস-পত্র তখন আর শুধু জিনিস-পত্র থাকে না, একটা নূতন গুণ এ সবের ভেতর দেখা দেয়। আমাদের অভাব ত এরা মেটাতে পারেই, উপরন্তু এদের সাহায্যে অন্য জিনিস-পত্রও আমরা কিনতে পারি।

কিন্তু বিনিময় থাকতে গেলে আর দুটো জিনিস থাকার দরকার হয়। সে দুটো হচ্ছে **শ্রমবিভাগ** ও **সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার**। প্রত্যেক সমাজেরই বিভিন্ন রকম জিনিস-পত্রের দরকার হয়। কিন্তু সমাজের প্রত্যেকেরই যার যা দরকার তাই নিজে তৈরী ক'রে নেয় না। তোমার হয়ত কাপড়ের দরকার, কিন্তু তুমি কাপড় তৈরী কর না; কাপড় তৈরী করে তাঁতী। আবার তাঁতীর হয়ত জুতোর দরকার,

কিন্তু জুতো তৈরী করে মুচি। এমনি ভাবে সমাজের মোট যা যা জিনিস দরকার, সেই জিনিসগুলো তৈরী করার ভার এক এক দল লোক নিয়ে নেয়। সমাজের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র তৈরীর জন্যে যে শ্রম দরকার তা ভাগ ক'রে এক এক দলের উপর এক এক রকম শ্রম করার ভার পড়ে। এই যে মোট আবশ্যকীয় শ্রম ভাগ ভাগ করে দেওয়া একেই বলে শ্রম-বিভাগ। শ্রমবিভাগ করে লাভ কি? শ্রমবিভাগ করলে প্রত্যেককেই শুধু একটা জিনিস তৈরী নিয়েই থাকতে হয় সারা জীবন। যেমন, যে মুচি সে জুতো তৈরী ছাড়া আর কিছু করে না। তার ফলে, জুতো তৈরী করতে সে খুব দক্ষ হয়ে পড়ে। খুব সহজেই অল্প পরিশ্রমে অনেক জুতো এবং ভাল ভাল জুতো সে তৈরী করতে পারে। এমনি প্রত্যেকেই তার নিজের কাজে খুব পটু হ'য়ে উঠে। এর জন্যে একই পরিশ্রমে জিনিস-পত্র অনেক বেশী তৈরী হ'তে পারে। সমাজের মোট উৎপাদনের ক্ষমতাও এতে বেড়ে যায়। কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকলেই যে বিনিময় থাকবে তার কোনো মানে নেই। মনে কর, সমাজের সবাই যে যা তৈরী ক'রল একে এক জায়গায় জড় ক'রল এবং সেখান থেকে যার যেমন দরকার সেই অনুযায়ী নিয়ে নিল। এ রকম হ'লে বিনিময় দরকার হয় না, যদিও শ্রমবিভাগ থাকে। কিন্তু বিনিময় থাকতে হ'লে শ্রম-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকা দরকার। অর্থাৎ যে যা তৈরী ক'রবে সেটা তার নিজেরই

জিনিস হওয়া চাই। সেটা যদি সমাজের হয় তা হ'লে বিনিময় হবে না।

কাপড় তাঁতীরই থাকবে, জুতো মুচিরই থাকবে এবং চাষ চাষীরই থাকবে,—এ রকম যদি নিয়ম হয়, তা হ'লে বিনিময় ছাড়া বেঁচে থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মনে কর মুচির খাবার দরকার, সে জুতো তৈরী করে। কিন্তু জুতো খেয়ে ত আর বাঁচা যায় না। তাই সে জুতো নিয়ে বাজারে হাজির হ'ল। আবার চাষীর জুতোর দরকার। সে চাল তৈরী করে, চাল নিয়ে সে বাজারে হাজির হ'ল। এর পরে দর কষাকষি ক'রে চাষী চাল দিয়ে জুতো পেল, আর মুচি জুতো দিয়ে চাল পেল। সুতরাং বিনিময় প্রথা থাকতে গেলে খুব বেশী রকম শ্রমবিভাগ চাই এবং জিনিস-পত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকা চাই। ব্যক্তিগত অধিকার থাকলে, শ্রমবিভাগ যত বাড়বে বিনিময় প্রথার তত বেশী দরকার হবে। এবং তখনই হবে পণ্য উৎপাদন প্রথার সৃষ্টি।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত দেখতে পাই। এর কতকগুলো স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীর শ্রেণীতে পড়ে, আর কতকগুলো পণ্য উৎপাদন প্রণালীর পর্যায়ে পড়ে, আবার কতকগুলো দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে। নীচের ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে সমাজ কিভাবে শ্রমকে স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে পণ্য উৎপাদন

প্রণালীর দিকে নিয়ে গেছে এবং এখন আবার পণ্য উৎপাদন প্রণালী থেকে ফিরে স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীর একটা উচ্চ স্তরের দিকে এগুচ্ছে :—

## উৎপাদন প্রণালীর স্তর

১। আদিম কম্যুনিস্ট উৎপাদন
↓
১। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন
ক) ক্রীতদাসমূলক
↓
খ) ভূমিদাসমূলক
↓
৩। কুটীর শিল্প
↓
৪। পুঁজিবাদী উৎপাদন
↓
ক) বণিকতন্ত্রের যুগ
↓
খ) কল-কারখানার যুগ
↓
গ) একচেটিয়া উৎপাদন
ব্যাঙ্ক ও সাম্রাজ্যবাদের যুগ
↓
৫। শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য
↓
৬। সমাজতন্ত্রবাদী উৎপাদন
↓
৭। কম্যুনিস্ট উৎপাদন

(১ – ৪ : স্বাভাবিক উৎপাদন; ভূমিদাসমূলক – একচেটিয়া উৎপাদন : পণ্য উৎপাদন; একচেটিয়া উৎপাদন – ৭ : স্বাভাবিক উৎপাদন)

উৎপাদন প্রণালীর ইতিহাসে এই কটা স্তর দেখা যায়। সব দেশই যে সব স্তর পার হয়ে এসেছে তা নয়। এক এক দেশ এক এক স্তরে র'য়েছে। কোন কোন দেশ খুব এগিয়ে গেছে আবার কোন কোন দেশ তত এগিয়ে যেতে পারেনি। পৃথিবীর আধাআধি দেশে এখন ক্যাপিটালিস্ট রীতিতে একচেটিয়া উৎপাদনের যুগ চলেছে; অন্যান্য দেশে, যেমন সোভিয়েতে, চীনে, পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। কম্যুনিস্ট সমাজের স্তরে কোন দেশই এখনও পৌঁছায়নি। তবে সমাজের গতি ঐ দিকে ব'লেই অর্থনীতির নির্দেশ।

উৎপাদন প্রণালীর প্রত্যেকটা স্তর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এই ছোট বইয়ে সম্ভব হবে না। এখানে খুব সংক্ষেপে প্রথম দিকের স্তরগুলোর আলোচনা করব। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী ও উৎপাদন সম্বন্ধই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হবে। এই উৎপাদন প্রণালীর কি ক'রে জন্ম হ'ল তাই আলোচনা ক'রতে গিয়ে অতীতের উৎপাদন প্রণালীগুলোও একটু দেখতে হ'বে।

## [ তিন ]

## স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী

আদিম কম্যুনিস্ট উৎপাদন প্রণালী হ'ল একেবারে আদিম যুগের কথা। মানুষ তখন নেহাৎই অসভ্য অর্থাৎ প্রায় পশু।

দলে দলে তখন তারা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত শিকার ও ফলমূলের সন্ধানে। রক্তের সম্বন্ধ ছিল যাদের সঙ্গে, তাদের নিয়ে এক একটা **দল** বা **ট্রাইব** গঠিত হ'ত। আত্মরক্ষার জন্য ও শিকার ক'রে খাদ্য যোগাড়ের জন্য এদের বাধ্য হ'য়ে দলবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হ'ত। গুহায়, গাছে এরা বাস করত। একজনকে দলের নেতা ঠিক ক'রে নিত। সে শিকারে বা ফলমূল যোগাতে কার কি কাজ হ'বে তা ভাগ করে দিত। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ এদের সমাজেও কিছু কিছু ছিল। মেয়েরা হয়ত ফলমূল যোগাড় ক'রে বেড়াত। আব পুরুষেরা যেত শিকারে। দিনের শেষে এরা যা পেত তাই সবাই মিলে খেত। দিনের খাবার এদের ছিল খুব অনিশ্চিত। একদিন হয়ত শিকার প্রচুর পেত, একদিন হয়ত একেবারে ফাঁকা যেত। কিন্তু বাড়তি যেদিন হ'ত, সেদিনের খাবার থেকেও কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখা সম্ভব ছিল না। মাংস বা ফলমূল কিছু টিকত না—পচে যেত। এদের সমাজের উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য তাহলে দেখতে পাচ্ছি—প্রথম, সবাই মিলে উৎপাদন করত; দ্বিতীয় সবাই মিলে ভোগ করত; তৃতীয়, ধনী গরীব কেউ ছিল না; তাই শ্রেণী ব'লে কিছু ছিল না; চতুর্থ, কিছু সঞ্চয় করাও সম্ভব ছিল না।

এই রকম সমাজ কিন্তু বেশী দিন টিক্‌ল না। তাদের উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থাৎ জিনিস-পত্র তৈরীর ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এরা আগুন আবিষ্কার

ক'রল, পাথর কেটে ধারাল অস্ত্র তৈরী করা শিখল, পশুপালন শিখল, চাষবাস শিখল। তখন আর জঙ্গলে জঙ্গলে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হ'ল না। কতকগুলো ট্রাইব পশু পালনের দিকে ঝুঁকে পড়ল বেশী। তারা তাদের ছাগল ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে এমাঠ ওমাঠ ক'রে বেড়াতে লাগল। আর কতকগুলো ট্রাইব কৃষিকাজ আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তারা লাঙ্গল আবিষ্কার এবং পশুশক্তির সাহায্য নিয়ে কাজ ক'রে নিজেদের পরিশ্রম অনেকখানি হাল্কা ক'রে নিল। এমনি ক'রে উৎপাদন ক্ষমতা যখন বেড়ে গেল তখন তাদের বাড়তিও কিছু থাকতে লাগল। চাষের ফসল ও পশু দুটোই বাড়তি হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম একটা ট্রাইব তাদের বাড়তি জিনিসপত্র অন্য একটা ট্রাইবের বাড়তি জিনিস পত্রের সঙ্গে বিনিময় করতে লাগল। কোনো ট্রাইব হয়ত চামড়া দিয়ে কিছু ধান নিয়ে নিল। এমনি ক'রে বিনিময়ের সূত্রপাত হ'ল। কিন্তু তখনও বিনিময় আকস্মিক ব্যাপারই ছিল। নিয়মিত একটা কিছু ছিল না। ধীরে ধীরে শ্রম-বিভাগও বেড়ে যেতে লাগল এবং লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল। এর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা এসে দেখা দিল। আগে একটা ট্রাইবের সঙ্গে অন্য একটা ট্রাইবের ঝগড়া হলে যুদ্ধ লেগে যেত এবং এর ফলে অনেক লোক মারা পড়ত। এইখানেই যুদ্ধের শেষ হ'ত। যারা যুদ্ধে বন্দী হ'ত, হয় তাদের মেরে ফেলা হ'ত, নয় তাদের নিজেদেরই একজন ক'রে

নেয়া হ'ত। কিন্তু কৃষিকাজ ও পশুপালন আবিষ্কার হওয়ার পর এইসব বন্দীদের দিয়ে জোর ক'রে চাষবাস বা পশুপালনের কাজ করিয়ে নেবার সুবিধা হ'ল। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দী হ'ত তাদের এক একটা ট্রাইবের দাস হ'য়ে থাকতে হ'ত। এমনি ভাবে সমাজে দুটো শ্রেণী হয়ে গেল—মনিব আর গোলাম। এইসব শক্তির সংঘাতের ফলে আদিম কম্যুনিস্ট সমাজ আর টিকল না। ধীরে ধীরে জমিজমা ও অন্যান্য জিনিস-পত্রে ব্যক্তিগত অধিকার এসে দেখা দিল। প্রথম প্রথম জমি প্রত্যেক বছর ভাগ ক'রে দেয়া হ'ত। কিন্তু শেষ অবধি জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার দাঁড়িয়ে গেল। এই ভাবে বহু যুগ ধ'রে সমাজে শ্রেণী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি হ'ল। কিন্তু শ্রমবিভাগ বিশেষ ব্যাপক না থাকায় বিনিময় প্রথা খুব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল।

## সামন্ততন্ত্র

জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হবার পর দেখতে দেখতে কতকগুলো লোক খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠল। অধিকাংশ জমি জমা এদের হাতে গিয়ে পড়ল। এরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য ছোট ছোট সৈন্যদল তৈরী করল। এরাই হ'ল ছোট ছোট রাজা। এই রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে আবার এক এক জন বড় রাজা হ'ল। যুদ্ধে হারাবার পর প্রথম প্রথম সে পরাজিত রাজার সমস্ত সম্পত্তি নিজে

দখল করে নিয়ে রাজাকে ভিটেছাড়া ক'রে দিত। কিন্তু যখন তার রাজ্য এত বড় হ'য়ে পড়তে লাগল যে নিজের পক্ষে আর দেখাশুনা করা সম্ভব নয়, তখন পরাজিত রাজার কাছ থেকে বছর বছর খাজনা বা কর আদায় করেই তাকে ছেড়ে দিত। এমনি ভাবে সামন্ত যুগের সৃষ্টি হ'ল।

গ্রীস এবং রোমে কিন্তু রাজা কেউ হ'তে পারল না। সেখানে তিন শ্রেণীর লোক দেখা দিল। প্রথমে ছোট ছোট স্বাধীন চাষী। নিজেদের জমি তারা নিজেরাই চাষ করত। তার পরে দেখা দিল, বড় বড় সম্পত্তিওয়ালা লোক, আর এদের অধীনে অনেকগুলো ক'রে ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের দিয়ে এই সম্পত্তিওয়ালা লোকেরা চাষবাস করাত। এদের ক্ষেত খামারগুলোকে ব'লত ল্যাটিফাণ্ডিয়া। এই ল্যাটিফাণ্ডিয়ার মালিকেরা ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের ওপর পরগাছার মত বেঁচে থাকত এবং প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে নানা প্রকার বিলাসিতায় জীবন যাপন ক'রত। এদের বিলাসিতার জিনিসপত্র যোগাড় করার জন্য বণিক শ্রেণীর উৎপত্তি হ'ল। বণিকেরা দেশবিদেশ থেকে নানারকম বিলাসিতার সামগ্রী এনে এদের কাছে বিক্রি ক'রত। এমন কি প্রাচীন গ্রীসে এই সব জিনিস পত্র তৈরীর জন্য বড় বড় কারখানাও সৃষ্টি হ'য়েছিল। সেগুলোকে ব'লত এরগাস্টেরীয়া। এখানে বহুসংখ্যক ক্রীত-দাস কাজ করত। রোম, গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সে এক গৌরবময় যুগ গেছে। ক্রীতদাসদের

পরিশ্রমের ওপর বেঁচে বড় লোকেরা প্রচুর অবসর পেত। তার ফলে নানা প্রকার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চায় এরা যথেষ্ট উন্নত হ'য়েছিল।

কিন্তু এদের এ সমাজও বেশী দিন টিকল না। এদের শাসক শ্রেণী বিলাসিতায় ডুবে অধঃপতিত হ'ল। যুদ্ধ বিগ্রহ করবার জন্য চাষীদের সাহায্য নিতে এরা সব সময়েই বাধ্য হ'ত। কারণ ক্রীতদাসদের দ্বারা যুদ্ধ করান সম্ভব নয়। এই স্বাধীন চাষীরা ল্যাটিফাণ্ডিয়ার মালিকদের প্রতিযোগিতায় আর উৎপীড়নে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। চাষীরা এদের কাছ থেকে ধার নিলে শতকরা ৪০ থেকে ৭০ মুদ্রা অবধি সুদ দিতে হ'ত। আর যুদ্ধের ব্যয়ভার চাষীদের ঘাড়েই বেশী চাপত, অথচ যুদ্ধে যে সব জিনিসপত্র বা দাস পাওয়া যেত তার ভাগ তাদের বিশেষ জুটত না। কারণ যুদ্ধ পরিচালনার ভার ধনীদের হাতেই ছিল। তারপর এই সব ধনিকদের নিজেদের মধ্যে দলাদলির অন্ত ছিল না। ক্রীতদাসেরাও যে অত্যাচার নিপীড়ন নিঃশব্দে সব সময় সহ্য করত তা নয়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দাস-বিদ্রোহে ওদের সমাজ ভেঙ্গে চুরে পড়বার অবস্থা হ'ত। কিন্তু দাসদের ভেতর তেমন সংগঠন না থাকায় একবারও তারা সফল হ'তে পারেনি। এই সব কারণে এদের সমাজ খুব দুর্বল হ'য়ে পড়ল এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হ'য়ে গেল।

ক্রীতদাস প্রথায় বিনিময়ের প্রচলন অনেকটা বেড়ে

গিয়েছিল। এবং তার ফলে বিনিময়েব সুবিধার জন্য মুদ্রা বা টাকার উৎপত্তি হয়। তা হলেও বিনিময় কার্য তখন খুব সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু মাত্র ধনীদের বিলাসিতার জিনিসপত্র এবং ক্রীতদাসই বেশীর ভাগ কেনা বেচা হ'ত। উৎপন্ন জিনিসপত্রের অধিকাংশই স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীতে তখনো উৎপাদিত হ'ত।

সামন্ত যুগের এই অধ্যায় শেষ হ'য়ে যাবার পর ধীরে ধীরে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন হ'ল। ভূমিদাসদের নিজেদের জমিতে অধিকার ছিল না। জমিদার যখন ইচ্ছা তাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারত। তাকে জমিদারের জমিতে সপ্তাহে তিন চার দিন বিনা বেতনে খেটে দিয়ে যেতে হ'ত। তাব উপরে আবার নানারকম ভাবে জমিদারকে আবওয়াব দিতে হ'ত। স্বাধীন চাষীদেরও এই সব অত্যাচার থেকে অব্যাহতি ছিল না। যদি কোন কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যেত তবে চাষী বাধ্য হ'য়ে জমিদারের কাছ থেকে ধার ক'বত এবং একবার ধার ক'রলে তার আব রক্ষা ছিল না। ধীরে ধীবে জমিদার তাকে ভূমিদাসে পরিণত কবে ফেলত। প্রথম প্রথম জমিদারের কাজ ছিল চাষীকে বাইরেব শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও চাষের যাতে উন্নতি হয় তা দেখা। যেমন খাল বা পুকুর কেটে জমিদাররা জলসেচের ব্যবস্থা কববে, ইত্যাদি। কিন্তু রাজার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ রক্ষার ভার রাজার হাতে গিয়ে পড়ল। জমিদার শুধু তাকে খাজনা দিয়েই খালাস

পেত। এবং জমিদারের আয় যখন প্রচুর হয়ে গেল তখন চাষের উন্নতির দিকে তার লক্ষ্য থাকল না। অধীনস্থ নায়েব গোমস্তাদের উপর সমস্ত কাজের ভার দিয়ে জমিদার নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে জীবন কাটাতে লাগল। এর ফলে জমিদারদের অত্যাচারের উপর আবার তার কর্মচারীদের অত্যাচার এসে চাষীদের ও ভূমিদাসদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। এই সকল কারণে বহুবার সমাজে চাষী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চাষীদের ভেতর সংগঠন ও একতার অভাবে এইসব বিদ্রোহ সফল হয়নি। তা ছাড়া সামন্ততন্ত্র ধ্বংস ক'রে দিয়ে কি রকম নূতন সমাজ গড়ে তুলবে সে সম্বন্ধেও তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

## কুটীর শিল্প

এই সময় প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন লোক থাকত যাদের প্রধান পেশা ছিল চাষীদের যে সব জিনিসপত্র দরকার সেগুলি তৈরী করা; যেমন, তাঁতী কাপড় তৈরী করত; মিস্ত্রী লাঙ্গল, ঘরদোর তৈরী ক'রত। এর বদলে চাষী তাদের খাওয়াপরার ভার বহন ক'রত। এরূপ তাঁতী, মিস্ত্রী প্রভৃতিদের বলা হয় **কুটীর শিল্পী**। কারণ নিজেদের কুটীরে ব'সে এরা এদের জিনিসপত্র তৈরী ক'রত। যে সব জায়গায় রাজা বা বড় বড় জমিদার বাস ক'রত সে সব জায়গায় ধীরে ধীরে এক একটা শহর গড়ে উঠল। রাজার সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী ইত্যাদি সব

সেখানে থাকত। এর ফলে সেখানকার কুটীরশিল্পীদের বেশ কিছু আয় হ'ত। সহরের কুটীরশিল্পীরা যে শুধু সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরী ক'রত তা নয়, রাজা রাজড়াদের বিলাসিতার জিনিসপত্রও অনেক তৈরী ক'রত। এমনিভাবে সহরে কুটীরশিল্প বেশ উন্নতি লাভ ক'রল। সহরের কুটীর-শিল্পীরা নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতা দূর করে বেশী লাভ করবার জন্য আবার নিজেদের খুব শক্তিশালী সমিতি বা গিল্ড তৈরী ক'রে নিল। প্রত্যেক কুটীরশিল্পীকে এই গিল্ডের সভ্য হ'তে হ'ত। যাতে উৎপাদন খুব বেশী না হ'য়ে যায় তার জন্য নিয়ম ছিল প্রত্যেক কুটীরশিল্পী দু'তিন জনের বেশী শিক্ষানবীস দোকানে রাখতে পারবে না। কাঁচা মাল কেনা, শিক্ষানবীসদের বেতন, তৈরী জিনিসের দাম ইত্যাদি সব কিছু সমিতি ঠিক ক'রে দিত। কুটীরশিল্পীর সংখ্যা যাতে খুব বেশী হ'য়ে না যায় তার জন্য এরা শিক্ষানবীসদের কিছুতেই কুটীরশিল্পী হবার অধিকার দিত না, তাদের শিক্ষার সময় বাড়িয়ে দিত, কুটীরশিল্পী হ'বার জন্য কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'ত এবং বেশ একটা মোটা টাকা সমিতিকে দিতে হ'ত। প্রথম প্রথম যে কেউ এই সব সর্ত পালন ক'রতে পারলে কুটীরশিল্পী হবার অধিকার পেত। কিন্তু পরে ক্ষমতাশালী কুটীরশিল্পীদের আত্মীয়স্বজন ছাড়া এই অধিকার সহজে কাউকে দেওয়া হ'ত না। এর ফলে শিক্ষা-নবীসদের ভেতর তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল এবং তারা নানা রকম ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে গিল্ডগুলোর বিরোধিতা ক'রতে

লাগল। বিনিময় প্রথা শহরে তখন দস্তুর মত চালু হ'য়ে গেছে। শ্রমবিভাগ অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে। শুধু যে এক একদল লোক এক একটা জিনিস তৈরী ক'রতে লাগল তা নয়, প্রত্যেক দলের তেতর অনেকগুলো ভাগ ক'রে এক একটা ছোট দল ঐ জিনিসটার এক একটা অংশ তৈরী করতে লাগল। যেমন কাপড় তৈরীর ব্যাপারে কেউ সুতো কাটে, কেউ রঙ করে, কেউ বা তাঁত বোনে ইত্যাদি। এর ফলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। এর পর থেকে শুরু হ'ল সমাজের এক নূতন অধ্যায়। স্বাভাবিক উৎপাদম প্রণালী নষ্ট হ'য়ে গিয়ে তার জায়গায় পণ্য উৎপাদন প্রণালী স্থাপিত হ'ল। কি ক'রে তা হ'ল তা পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব।

## [ চার ]

## পণ্য উৎপাদন প্রণালী

শ্রমবিভাগ বেড়ে যাওয়ায় কুটীরশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল। শহরের চাহিদা মিটিয়েও অনেক জিনিস বাড়তি থেকে যেতে লাগল। বণিকেরা তখন এই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে দেশবিদেশে চালান দিতে থাকল। এতে তাদের লাভ হত প্রচুর এবং যত বেশী লাভ হতে লাগল ততই অতি উৎসাহে তারা ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকল। বণিকেরা

তখন কুটীরশিল্পীদের আগে থাকতেই টাকা পয়সা দাদন দিয়ে তাদের কাজে সাহায্য করতে লাগল। এর ফলে কুটীরশিল্পীদের অনেকে ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোর ভিতর এসে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীরা কুটীরশিল্পীদের একেবারে সম্পূর্ণরূপে অধীন ক'রে ফেলল। প্রথম প্রথম বণিক শুধু তাদের কাঁচামাল দিত এবং তৈরী জিনিস কিনে নিত। কুটীর-শিল্পী ঐ বণিক ছাড়া আর কারও কাছে মাল বিক্রী করতে পারত না। শেষে কুটীরশিল্পীকে তার কুটীর ছেড়ে বণিকের বাড়ী এসেই কাজ করতে হত। বণিক যাবতীয় উৎপাদন যন্ত্র (অর্থাৎ পণ্য তৈরীর জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি) সেখানে তাকে দিত। এই রকম ক'রে কারখানার সূত্রপাত হ'ল। তার মানে, কুটীরশিল্পী মজুরে পরিণত হ'ল ও বেতনের বিনিময়ে তারা কারখানায় খাটতে লাগল। কুটীরশিল্পীদের সমিতি ও গিল্ডগুলো ভেঙ্গে গেল। শিক্ষানবীসেরা কুটীর-শিল্পীর দোকান ছেড়ে কারখানায় কাজ নিল। কুটীরশিল্পীদের ভেতর যাদের অবস্থা ভাল তারা নিজেরাই গিল্ডের আইন ভেঙ্গে বেশী সংখ্যায় মজুর তাদের দোকানে খাটাতে লাগল। অর্থাৎ তাদের কুটীরটিকে কারখানায় পরিণত ক'রল। কুটীরশিল্পীদের ভেতর যারা গরীব তারা এইসব বড় বড় কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বণিকের দুয়ারে কাজের জন্য হাজির হ'ল।

বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদিকে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি

হ'ল। যানবাহনের উন্নতি হ'ল। দেখতে দেখতে বিনিময় প্রথা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। জমিদারেরা আগে চাষী ও ভূমিদাসদের কাছ থেকে শস্য আদায় করত। আর শস্যের বাজার সীমাবদ্ধ ছিল বলে জমিদারদের আদায়ও সীমাবদ্ধ ছিল। এখন অন্যান্য পণ্যের বাজার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শস্যের বাজারও বেড়ে গেল। তার ফলে জমিদারদের আদায়েরও আর সীমা থাকল না। চাষীদের ও ভূমিদাসদের উপর শোষণ হাজার গুণ বেড়ে গেল। অনেক চাষী ও ভূমি-দাস গ্রামে আর টিকতে না পেরে পালিয়ে সহরে চলে যেতে লাগল কাজের খোঁজে। জমিদাররা এই পালিয়ে যাওয়া তখন আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করল। আবার কোন কোন দেশে জমিদার নিজেই চাষীদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমিতে ভেড়া চড়াতে লাগল। কারণ সেখানে তখন পশম তৈরী খুব লাভজনক ছিল। এমনি করে চাষীরা জমি থেকে বিতাড়িত হ'য়ে ও দরিদ্র হ'য়ে পড়ায় গ্রামের কুটীরশিল্পীদের ব্যবসা নষ্ট হ'য়ে গেল। কারণ এতদিন গ্রামের চাষী ও ভূমিদাসরাই তাদের জিনিসপত্র কিনত। এখন গ্রামের কুটীরশিল্পীরাও শহরে কাজের খোঁজে চলে গেল।

দেখতে দেখতে শহরের পর সহর ফেঁপে উঠল। শহরের লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেল। সেখানে বড় বড় কারখানা তৈরী হ'ল। কারখানায় শ্রমবিভাগ আরও সূক্ষ্ম হ'ল। কলকব্জা আবিষ্কার হ'ল। তখন দশজন শ্রমিকের কাজ একজন শ্রমিক

ক'রতে লাগল। আর এই সব জিনিস বিক্রির জন্য নূতন নূতন বাজার খুঁজে নিতে হল। এভাবেই ভারতে আসবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার হ'ল, আমেরিকা আবিষ্কার হ'ল। এসব দেশ হল মাল বিক্রির মস্ত জায়গা, তাই এদের বলা হয় বাজার। এইসব বড় বড় বাজার পেয়ে বণিকরা জেঁকে বসল।

কিন্তু জমিদাররা তখন রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আইন তৈরীর অধিকার তাদেরই হাতে। কাজেই বাণিজ্যে বণিকদের অসুবিধা হ'তে লাগল খুব। এক জমিদারী থেকে আর এক জমিদারীতে মালপত্র নিয়ে গেলে তাদের শুল্ক দিতে হ'ত। সময় সময় জমিদার তাদের মাল বাজেয়াপ্ত ক'রে নিত অতি সামান্য অজুহাতে। বণিকরা তখন রাজাকে টাকা পয়সা দিয়ে প্রচুর সাহায্য ক'রতে লাগল, জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে তাদের শাসনে আনবার জন্য। বণিকদের সাহায্য নিয়ে রাজা এই সব জমিদারদের পরাস্ত করে দিল। এক একটা দেশে শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হ'ল। ব্যবসা, বাণিজ্য ও উৎপাদনের দিক থেকে সমস্ত দেশ এক হ'য়ে গেল। দেশের ভেতর আর ভাগ ভাগ কিছু থাকল না। জমিদাররা বহু পূর্বেই তাদের বিলাসিতার খরচ যোগাতে না পেরে বণিকদের কাছে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছিল এবং ঋণ নেবার সময়ে শহরের ব্যাপারে অনেক ক্ষমতা বণিকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। এবার শহরগুলো সম্পূর্ণরূপে বণিকদের হাতে চলে গেল। ধীরে ধীরে এরা এত শক্তিশালী হ'য়ে উঠল যে ফরাসী বিপ্লবের

পর সমস্ত দেশটাই বণিকদের হাতে এসে পড়ল। এবং এরা নিজেদের ইচ্ছা মত আইন কানুন তৈরী ক'রে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হ'তে লাগল। এর পর থেকে পুঁজিবাদী বণিকতন্ত্রের যুগ শেষ হ'ল। কল-কারখানার যুগ আরম্ভ হল। সমাজের অধিকাংশ জিনিস-পত্র বিনিময়ের জন্য তৈরী হ'তে লাগল। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে পণ্য উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত হ'ল, গোটা সমাজটাই কেনা বেচা ক'রে জীবনধারণ ক'রতে লাগল।

## [ পাঁচ ]

## পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই যে, এখানে জিনিসপত্র এক একটা বড় বড় কারখানায় কলকব্জার সাহায্যে হাজারে হাজারে তৈরী হয় এবং কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক এসে মজুরীর বিনিময়ে খাটে। কাবখানায় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কল-মালিকেরই থাকে এবং কল-মালিক উৎপন্ন জিনিস-পত্র বাজারে বিক্রি করে। বিনা স্বার্থে যে কলমালিক কারখানা চালু রাখে তা নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে লাভ করা। লাভের জন্যই সে ব্যবসা করে।

এই সব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি কিনে কারখানা চালু ক'রতে গেলে অনেক টাকার দরকার হয়। এই টাকাকে বলি পুঁজি

বা মূলধন। একবার উৎপাদন আরম্ভ ক'রতে পারলে যে লাভ হয় তা' থেকে পুঁজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে কারখানা আরও বড় করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথম কারখানা আরম্ভ করার জন্য কলমালিকরা টাকা কোথায় পেল? এর উত্তর দিতে গিয়ে অনেকে বলেন আয় থেকে লোকে বাঁচিয়ে জমা ক'রে ক'রে পুঁজি সঞ্চয় ক'রেছিল। কিন্তু সামন্ত যুগে এক জমিদার ছাড়া আর সকলেরই আয় ছিল খুব সামান্য। সুতরাং অধিকাংশের পক্ষে কিছু বাঁচান সম্ভবই ছিল না। কি ক'রে প্রথম পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল তার খানিকটা আভাস আমরা আগের অধ্যায়ে পেয়েছি। এ পুঁজির অধিকাংশই লুণ্ঠন, ডাকাতি ও নিষ্ঠুর শোষণের ফল। বণিকেরা কি ক'রে কুটীর-শিল্পীদের শোষণ ক'রত তা' আমরা দেখেছি। চাষীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বণিকেরা তাদেরও ঠকাতে ছাড়ত না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ধন সঞ্চয় তারা করেছিল এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসা ক'রে, নিগ্রো দাস ব্যবসায়ে ও আমেরিকার ধন সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে। এই সময় বড় বড় কোম্পানী গ'ড়ে এরা এশিয়া আফ্রিকায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এদের ভিতর একটি। এরা এশিয়া ও আফ্রিকায় এসে যে ব্যবসা ক'রত তাকে লুঠ ও ডাকাতি বলাই ঠিক হবে। এদের কর্মচারীরা পর্যন্ত এত বেশী ধনী হ'য়ে দেশে ফিরত যে ওদের দেশের লোকও এদের "নবাব" বলে বিদ্রূপ করত। আফ্রিকার নিগ্রোদের যেভাবে জঙ্গলে

গিয়ে শিকার ক'রে বন্দী ক'রে ক্রীতদাস ক'রে দেশ বিদেশে (বিশেষ ক'রে আমেরিকায়) চালান দিত, তার ইতিহাস যেমনই ঘৃণ্য তেমনই নিষ্ঠুর। এই দাস ব্যবসায়ে বহু লোক মস্ত ধনী হ'য়ে গেছে এবং দেশে তারা সম্মানও পেত বিস্তর—এখন যেমন কলমালিকেরা পায়। আমেরিকার সোনার গন্ধ পেয়ে এরা দলে দলে আমেরিকা ছুটেছিল জোঁকের মত তাদের ব্যবসার প্রথম পুঁজি যোগাড় ক'রতে। সেখানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের প্রায় ধ্বংস ক'রে দিয়ে এরা পুঁজি যোগাড় করেছিল। **কার্ল মার্কস** তাঁর বিখ্যাত বই **ক্যাপিটালে** এক জায়গায় লিখেছেন—

"এইরূপে আমেরিকার সোনা রূপার খনি আবিষ্কার, ঐ সব দেশের লোকেদের ঐ জায়গা থেকে একেবারে মুছে ফেলা বা ক্রীতদাসে পরিণত করা বা খনির ভেতর তাদের কবর দেওয়া, ইস্ট ইণ্ডিজ দখল ও লুণ্ঠন এবং আফ্রিকাকে নিগ্রো ক্রীতদাস শিকারের ক্ষেত্রে পরিণত করা—এইগুলো হ'ল **পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর আরম্ভ**। এই সব শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রথমে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়।"

এমনি ভাবে অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়ে বণিকেরা তাঁদের পুঁজি সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু পুঁজি থাকলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন চালু করা যায় না। তার জন্য হাজার হাজার মজুরেরও দরকার হয়। মজুর না হ'লে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী অচল। এই মজুরের যোগাড়

হ'ল কি করে? মজুরেরা স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে কারখানায় যে কাজ করতে এসেছে তা নয়। কারখানায় এসে তারা বিশেষ সুখে ছিল না। ১৭।১৮ ঘণ্টা অবধি তাদের কাজ করতে হত। আর মাইনে যা পেত' তাতে কোন মতে বেঁচে থাকা চলত। ছোট ছোট ছেলেরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কলের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ত, তখন সর্দার এসে চাবুক মেরে তাদের ঘুম থেকে তুলত অথবা ঘুম ভাঙাবার জন্যে শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে আনত। এ রকম অবস্থার ভেতর কাজ ক'রতে তারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় আসেনি; অবস্থায় পড়ে বাধ্য হ'য়ে এসেছিল।

চাষী ও ভূমিদাসদের জমিদার অত্যাচার ক'রে ভিটে-ছাড়া ক'রে তাড়িয়ে দিল। তারা বেঁচে থাকার আর অন্য উপায় না দেখে সহরে এসে কারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হ'ল। চাষীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ায় গ্রামের কুটীরশিল্পীরাও ব্যবসা হারিয়ে সহরে আসতে বাধ্য হ'ল। সহরের কুটীর শিল্পীরাও প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কলমালিকদের দ্বারস্থ হতে লাগল। এমনি ক'রে চাষী, ভূমিদাস, কুটীরশিল্পী ও শিক্ষানবীসরা বাঁচবার দ্বিতীয় উপায় না দেখে কারখানায় এসে কাজ ক'রতে বাধ্য হ'ল। কলমালিকদেরও সুবিধে হ'ল খুব। এদের কম মাইনে দিয়ে খাটিয়ে তারা বিস্তর লাভ ক'রতে লাগল। এমনি ক'রে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী শুরু হ'ল পুঁজি ও মজুর যোগাড় ক'রে, এবং

যতই এই প্রণালীতে উৎপাদন চালু হ'তে লাগল, পুঁজি তত বেড়ে যেতে লাগল এবং পুঁজি বাড়ার সাথে সাথে আরও জোর এই প্রণালী চলতে থাকল।

## [ ছয় ]

## মূল্য

আমরা আগে দেখেছি যে পণ্যের দুটো গুণ আছে। এক, পণ্য আমাদের কাজে লাগে অর্থাৎ আমাদের কোন না কোন অভাব মেটায়; আর দুই, পণ্য বাজারে কেনা বেচা হয়। অভাব না মেটালে সে পণ্য বাজারে কেনা বেচা হ'তে পারে না। যে জিনিস কোনো কাজে লাগে না, তা' কেউ কেনে না। কাজেই কেনা বেচার জিনিস হ'তে হলে পণ্যের অভাব মেটাবার ক্ষমতা থাকা চাই-ই। পণ্যের এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে বলে **ব্যবহারিক মূল্য**। যে জিনিসের যত বেশী অভাব পূরণের ক্ষমতা, তার ব্যবহারিক মূল্যও তত বেশী। কিন্তু ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই জিনিস-পত্র কেনা বেচা হয় না। যেমন বাতাসের ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশী। বাতাস না হলে আমরা দু'এক মিনিটের বেশী বাঁচতে পারি না। কিন্তু বাতাস কি বাজারে বেচা কেনা হয়? কাজেই ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই জিনিসপত্র পণ্য হয় না। পণ্য হ'তে গেলে অর্থাৎ বাজারে কেনা বেচার উপযুক্ত হ'তে গেলে, জিনিস-পত্র

মানুষের পরিশ্রমের ফল হওয়া দরকার। যে জিনিস পেতে গেলে কোন পরিশ্রম দরকার হয় না, ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়, সে জিনিস কেউ পয়সা খরচ ক'রে কেনে না—অর্থাৎ সে জিনিস পণ্য হ'তে পারে না। পণ্যের এই ক্রীত ও বিক্রীত হবার অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষমতা বা গুণকে বলা হয় **বিনিময় মূল্য**। কোন কোন পণ্যের অন্যান্য জিনিস-পত্র কিনবার ক্ষমতা খুব কম। তাদের বিনিময় মূল্য কম। আবার কোন কোন পণ্যের এই ক্ষমতা খুব বেশী, তাদের বিনিময় মূল্যও খুব বেশী। বিনিময় মূল্য পেতে গেলে পণ্যের শুধু মাত্র ব্যবহারিক মূল্য থাকলে চলবে না, মানুষের পরিশ্রমের ফল হওয়া চাই। যে পণ্য তৈরী ক'রতে যত বেশী পরিশ্রম লাগে, তার বিনিময় মূল্য তত বেশী হয়। মনে কর, বাজারে এক জোড়া কাপড়ের বদলে এক বস্তা ধান বিনিময় হ'চ্ছে। সুতরাং আমরা লিখতে পারি—

১ জোড়া কাপড়=১ বস্তা ধান

কাপড় আর ধান কোন্ দিক দিয়ে সমান হ'ল? তাদের ব্যবহারিক মূল্য নিশ্চয়ই সমান নয়। কাপড় যে অভাব পূরণ করে, ধান সে অভাব পূরণ করে না, আবার ধান যে কাজে লাগে, কাপড় সে কাজে লাগে না। ধান থেকে চাল করে খাওয়া যায়, তাতে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু কাপড় খেয়ে ক্ষুধা মেটান কষ্ট। কাজেই ব্যবহারিক মূল্যের দিক দিয়ে এদের

তুলনা চলে না। এরা কোন্ দিক দিয়ে তা'হলে সমান? এরা বিনিময় মূল্যের দিক দিয়ে সমান। এক জোড়া কাপড়ের যে বিনিময় মূল্য এক বস্তা ধানেরও সেই বিনিময় মূল্য। এদের বিনিময় মূল্য সমান হ'ল কি ক'রে? এক জোড়া কাপড় তৈরী করতে যে পরিশ্রম লেগেছিল, এক বস্তা ধান তৈরী করতেও সেই পরিশ্রম লেগেছে ব'লে। ঐ পরিশ্রম দিয়েই যদি ২ বস্তা ধান তৈরী করা যেত, তবে ১ জোড়া কাপড় ২ বস্তা ধানের সমান হ'ত। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, যে জিনিসের ভেতর যত বেশী পরিশ্রম থাকবে তার বিনিময় মূল্য তত বেশী হবে।

কিন্তু চাষীর ধান তৈরীর পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁতীর কাপড় তৈরীর পরিশ্রমের তু'লনা হ'তে পারে না। চাষীর পরিশ্রম এক রকমের আর তাঁতীর পরিশ্রম অন্য রকমের। সুতরাং কি ক'রে এদের সমান বলি, বা একটা অপরটার দ্বিগুণ বলি? পণ্যের যেমন দুটো বিভিন্ন গুণ আছে তেমনই পরিশ্রমেরও দুটো বিভিন্ন রূপ আছে। একটা হচ্ছে বাস্তব বা মূর্ত রূপ (concrete labour) আর একটা হচ্ছে সাধারণ বা বিমূর্ত রূপ (abstract labour). যে কোন রকম পরিশ্রমই করা হ'ক না তাতে খানিকটা শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয়িত হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয় এবং কিছুটা পরিমাণে শরীরের ক্ষয় হয়। পরিশ্রমকে যখন যে কাজের ভিতর দিয়ে পরিশ্রম করা হ'চ্ছে তার থেকে আলাদা ক'রে কোন্ ধরনের পরিশ্রম করা

হ'চ্ছে তা দেখে শুধু পরিশ্রম হিসাবেই দেখি, শুধু শারীরিক ও মানসিক শক্তির ব্যয় হিসাবেই দেখি, তখন পরিশ্রমকে বলব **সাধারণ** বা **বিমূর্ত শ্রম**। এ ক্ষেত্রে চাষীর শ্রমকে চাষের কাজে নিযুক্ত পরিশ্রম বলে ধরব না ; তাঁতীর শ্রমকে তাঁতের কাজে নিযুক্ত শ্রম বলেও ধরব না। শুধু তাদের কাজের জন্য যে পরিশ্রম ব্যয়িত হয় সেই পরিশ্রম নেব। **বাস্তব শ্রমের** বেলা কিন্তু এই সাধারণ শ্রম কি ভাবে ব্যয়িত তা দেখব। তাঁতের কাজ করলে বলব তাঁতীর শ্রম আর চাষের কাজ করলে বলব চাষীর শ্রম। সাধারণ বিমূর্ত শ্রমের দিক দিয়ে পরিশ্রমের ভেতর কোন পার্থক্য নেই, শুধু কম বেশীর মাত্রা আছে। তাঁতীর শ্রম, চাষীর শ্রম আর অন্যান্য সব শ্রম একই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল কাজে যে শক্তি ব্যয়িত হ'চ্ছে শুধু সেটাই নিচ্ছি। কিন্তু বাস্তব বা মূর্ত শ্রমের বেলা তাঁতীর শ্রম থেকে চাষীর শ্রম নিশ্চয়ই আলাদা। সেইজন্য যখন বলি এক জোড়া কাপড় তৈরীর পরিশ্রমের সঙ্গে এক বস্তা ধান তৈরীর পরিশ্রম সমান, তখন আমরা পরিশ্রমের বাস্তব বা মূর্ত রূপ তুলনা করি না, সাধারণ বা বিমূর্ত রূপ তুলনা করি।

পণ্যে যেমন ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য এক সঙ্গেই থাকে, তেমনি পরিশ্রমের এই দুটো রূপও এক সঙ্গেই থাকে। সাধারণ শ্রম ব্যয়িত হতে পারে না বাস্তব শ্রমের রূপ না নিয়ে।

পণ্যের বিনিময় মূল্য কিন্তু এই সাধারণ শ্রমের উপর নির্ভর

করে এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলেই পণ্যের মধ্যে আমরা তুলনা আনতে পারি।

কিন্তু পরিশ্রম হ'লেই মূল্য সৃষ্টি হয় না। মূল্য সৃষ্টি করতে হ'লে এই পরিশ্রম সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয় হওয়া চাই। অর্থাৎ যে পণ্য তৈরী হবে তা সমাজের কারও কোন না কোন কাজে লাগা চাই, কারও কোন না কোন অভাব পূরণ করা চাই। কারও কোন অভাব পূরণ যদি সে পরিশ্রমের দ্বারা না হয় তবে সে শ্রম পণ্ডশ্রম হবে। তাতে কোন বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হবে না। কারণ সে পরিশ্রমের দ্বারা তৈরী জিনিস কেউ কিনবে না। মনে কর, তুমি খুব পরিশ্রম করে একটা ছবি আঁকলে। কিন্তু সে ছবি এমন হ'ল যে ব্যাণ্ডেজে টিনচার আইডিন ঢেলে দিলে তার চাইতে ভাল ছবি হয়। তা হ'লে তোমার পরিশ্রম যত কঠোর পরিশ্রমই হ'ক না কেন সমাজের পক্ষে তা অনাবশ্যক হবে। এবং এরকম অনাবশ্যক শ্রম মূল্য সৃষ্টি (বিনিময় মূল্যকেই সংক্ষেপে মূল্য বলব) ক'রবে না। তা হ'লে দেখতে পাচ্ছি, সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় সাধারণ শ্রম দিয়ে মূল্য সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সমস্যা এখানেই দূর হ'ল না। মনে কর, একজন তাঁতী খুব বেশি নিপুণ আর পরিশ্রমী, আর একজন ভাল কাজ জানে না। কার পরিশ্রম দিয়ে কাপড়ের মূল্য ঠিক করা হবে? নিপুণ যে সে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী জোড়া

কাপড় তৈরী করবে। এর ফলে প্রত্যেক জোড়া কাপড়ে তার কম পরিশ্রম থাকবে এবং মূল্যও কম হবে। আর অজ্ঞ তাঁতী যে, সে হয়ত একজোড়া তৈরী করতে এক মাসই লাগিয়ে দেবে। সুতরাং তার কাপড়ে এক মাসের পরিশ্রম থাকবে এবং মূল্যও খুব বেশী হবে। কিন্তু একই রকম কাপড়ের দু'রকম মূল্য হ'তে পারে না। মূল্য তা হ'লে কি করে ঠিক হ'বে! মূল্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের পরিশ্রম দিয়ে ঠিক হবে না। ঠিক হবে গড়ে প্রত্যেক জোড়া কাপড়ে কত পরিশ্রম দরকার হয় তাই দিয়ে। গড়ে যদি ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রম লাগে, তবে তাই দিয়েই কাপড়ের মূল্য ঠিক হবে। মনে কর সমাজে ৩ খানা কাপড় তৈরী হয়েছে। প্রথমটায় ১ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে, দ্বিতীয়টায় ২ ঘণ্টার ও তৃতীয়টায় লেগেছে ৩ ঘণ্টার পরিশ্রম। তাহলে ৩ খানা কাপড়ে মোট ৬ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকটা কাপড়ে ২ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে। অতএব প্রতিটি কাপড়ের মূল্য হবে ২ ঘণ্টা পরিশ্রমের সমান। যে তাঁতী ১ ঘণ্টায় কাপড় তৈরী করেছে সেও ২ ঘণ্টার মূল্য পাবে আর যার ৩ ঘণ্টা লেগেছে সেও ২ ঘণ্টার মূল্য পাবে। এই রকম ভাবে গড়পড়তা পরিশ্রমের সময় দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হবে।

কেউ কেউ আবার অল্প সময় খাটলেও খুব বেশী পরিশ্রম ক'রতে পারে। আবার কেউ কেউ অনেকক্ষণ খাটলেও এমন হাল্কা ভাবে খাটে যে তাতে বিশেষ পরিশ্রম হয় না। একে

বলে **পরিশ্রমের ঘনত্ব** ( intensity of labour ), অল্প সময় হ'লেও পরিশ্রম যদি খুব কঠোর হয় তবে তার ঘনত্ব বেশী। আর যদি পরিশ্রম খুব কম হয় তবে তার ঘনত্ব কম। মূল্য মাপবার সময় আমাদের এই পরিশ্রমের ঘনত্ব হিসাবের ভেতর নিতে হবে। গড়ে পরিশ্রমের যে ঘনত্ব সেই ঘনত্বই আমরা হিসাবে নেব।

সুতরাং আমরা বলতে পারি পণ্যের মূল্য সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় সাধারণ শ্রমের গড়পড়তা নিপুণতা ও ঘনত্ব দিয়ে সৃষ্টি হয়। এই শ্রম আবার সময় দিয়ে মাপা হয়। যত বেশী ঘণ্টা শ্রম করা হবে তত বেশী মূল্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং কোন জিনিসের মূল্য কত হবে তা নির্ভর করে কত ঘণ্টার সামাজিক শ্রম ঐ পণ্য তৈরীর জন্য ব্যয়িত হ'ল তার উপর।

কিন্তু পণ্য বাজারে এনে যখন হাজির করা হয়, তখন কেউ বলে না, আমার কাপড়ের মূল্য ২৪ ঘণ্টা সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় পরিশ্রম। পণ্যের মূল্য বাজারে প্রকাশ করা হয় ও মাপা হয় অন্য পণ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে। যেমন এক জোড়া কাপড় এক বস্তা ধানের সমান। টাকা পয়সা প্রচলিত থাকলে টাকার সাহায্যে মূল্য প্রকাশ করা হয়। টাকার সাহায্যে মূল্য মাপলে তাকে বলে **দাম**। যেমন একজোড়া কাপড়ের দাম ২০'০০ টাকা। দাম কিন্তু সব সময় ঠিক মত মূল্য মাপতে পারে না। কারণ দাম শুধু যে মূল্যের উপর নির্ভর করে তা নয়। দাম অনেক অংশে পণ্যের **চাহিদা** ও

আমদানির উপর নির্ভর করে। বাজারে যদি অনেক পণ্য এসে যায় তা হ'লে পণ্য যারা বিক্রি ক'রতে চায় তাদের ভেতর বিক্রির জন্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। সবাই তার নিজের জিনিসটা বিক্রি ক'রতে চায়। এবং ক্রেতার সংখ্যাও কম হওয়ায় বিক্রি করার জন্য দাম কমিয়ে দেয়। এমনি করে আমদানী বেশী হ'লে দাম প'ড়ে যায়। আবার চাহিদা বেশী হ'লে দাম চড়ে যায়। ক্রেতারা সবাই জিনিস কিনবার জন্য পরস্পরের ভেতর প্রতি-যোগিতা করে এবং একে অন্যের চাইতে বেশী দাম দিতে চায় যাতে সে কিনতে পারে। এমনি করে চাহিদা ও আমদানির টানাপ'ড়েনে দাম ওঠানামা ক'রতে থাকে। কিন্তু দামের এই ওঠানামা মূল্যের কাছাকাছিই থাকে। মনে কর, কতকগুলি সেলাইয়েব কল আর পেন্সিল বিক্রি হবে। সেলাইয়ের কলের চাহিদা দশ আর আমদানিও দশ। পেন্সিলেরও চাহিদা দশ আর আমদানিও দশ। দু'টোর মূল্যই কি সমান হ'বে? তা হবে না। কারণ সেলাইয়ের কল তৈরীতে অনেক বেশী পরিশ্রম লেগেছে বলে এর মূল্য অনেক বেশী; আর পেন্সিলে কম পরিশ্রম লেগেছে বলে মূল্য অনেক কম। সেলাইয়ের কলের চাহিদা যদি বাড়ে বা আমদানি কমে তা হ'লে মূল্য থেকে দাম খানিকটা চড়ে যাবে; আর যদি চাহিদা কমে যায় বা আমদানি বেড়ে যায়, তা হ'লে দাম মূল্যের নীচে নেমে যাবে। চাহিদা ও আমদানি যখন সমান হবে তখন মূল্য ও দাম সমান হবে।

শ্রম সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় কিনা পণ্য বাজারে উপস্থিত না ক'রলে তা বুঝতে পারা যায় না। যদি পণ্য সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় হয় তা হ'লে মূল্যের দামেই পণ্য বিক্রি হ'য়ে যায়। আর যদি অনাবশ্যক হয় তা হ'লে মূল্যের চাইতে তাঁর দাম অনেক নেমে যায়। দাম নেমে গেলে বুঝতে হবে ঐ পরিশ্রম অন্য কোন পণ্য তৈরীর কাজে লাগান উচিত। আবার যদি সমাজের দরকার খুব বেশী বেড়ে যায় তা'হলে দাম মূল্যের চাইতে বেশী উঠে যায়। তখন বুঝতে হবে অন্য জিনিস তৈরী না করে এই জিনিসই তৈরী ক'রতে হবে।

## [ সাত ]

## বিনিময় ও টাকা

আদিম যুগে বিনিময় ছিল আকস্মিক গোছের। হয়ত একদল শিকারী একদল চাষীর কাছ থেকে মাংসের বদলে কিছু শস্য নিয়ে নিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিনিময় প্রথা বেড়ে যেতে থাকে। প্রথম প্রথম বিনিময় হ'ত পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে। টাকা তখনও লোকে জানত না। এ রকম বিনিময়কে বলে বার্টার বা অদলবদল। অদলবদলে অসুবিধা অনেক। মনে কর একদল চাষীর

এক জোড়া কাপড় দরকার, তার কিছু ধান বাড়তি আছে। ধান দিয়ে সে কাপড় কিনতে চায়। এরকম অবস্থায় তাকে খুঁজে পেতে এমন আর একজনকে বার ক'রতে হবে যে কাপড় দিয়ে ধান কিনতে ইচ্ছুক। যতদিন সে সেরকম একজন না পাবে ততদিন আর কাপড় কেনা তার হবে না। তাই বিনিময় প্রথা যখন বেশ চালু হ'য়ে উঠল তখন বিনিময়ের সুবিধার জন্য এমন একটা পণ্যের দরকার হ'ল যা সবাই সব সময়ে কিনতে রাজী আছে। মনে কর গরুই এ রকম একটা পণ্য। সবাই গরু কিনতে সব সময়ই রাজী। কারণ গরু চাষীর সমাজে সব সময়ই সবার লাগে। যে চাষীর ধান বিক্রি ক'রে কাপড় কেনবার দরকার, সে চাষী ধান বিক্রি ক'রল গরুর বদলে ; এবং পরে যার কাপড় বিক্রি করা দরকার গরু দিয়ে তার কাছ থেকে কাপড় কিনল। অদলবদলের যুগে বিনিময় ছিল—

ধান = কাপড়

এখন হ'ল—ধান = গরু = কাপড়

এতে গরুর সাহায্যে কেনা বেচা খুব সহজেই হ'য়ে গেল। এটা সম্ভব হ'ল কেন না গরুর জন্য একটা সাধারণ চাহিদা আছে। সবাই সব সময় গরু কিনতে ইচ্ছুক। এর ফলে গোধনের দ্বারা সমাজে কেনা বেচা হ'তে লাগল। অর্থাৎ গরু 'ধান' বা টাকায় পরিণত হ'ল। তখন

এমনি ক'রে যে সব পণ্য সবাই নিতে রাজী ছিল সে সব পণ্যই টাকার কাজ ক'রেছে। গরু, ভেড়া, ঘোড়া, কুড়াল, কাপড়, কড়ি, তামা, লোহা, এবং সর্বশেষে রূপা ও সোনা টাকার কাজ করেছে। রূপা ও সোনা অন্যান্য সব জিনিস-গুলোকে হারিয়ে দিয়ে একমাত্র টাকা হবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তার কারণ হ'চ্ছে রূপা ও সোনা নষ্ট হয় না, এমন কি অনেক দিন রাখলে ক্ষয় হয়েও যায় না। আর এদের ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করা যায়, তাতে ওজনের ক্ষতি হয় না। আবার অল্প ওজনের ভেতরই, সোনা ও রূপার মূল্য থাকে অনেক। তাতে অনেক টাকা পকেটে ক'রে নিয়ে চলাফেরায় অসুবিধা নেই। পঞ্চাশ টাকার জিনিস কিনে যদি গরুর টাকায় দাম নিতে চাও, গরুটাকে কাটলে চলবে না। তোমাকে খুঁজে পেতে আর একটা গরু বার করতে হবে যার মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ঘোড়ার টাকার প্রচলন হলে তারও অনেক অসুবিধা ছিল; তবে টাকার পিঠে চড়ে বাজারে জিনিস কিনতে যাওয়া যেত। সোনা রূপার প্রচলন হলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই যে, সোনা রূপা পৃথিবীর সব দেশের লোকই সব সময় নিতে রাজী। এর ফলে সোনা বা রূপা দিয়ে জিনিস-পত্র কিনতে কিছু অসুবিধা হ'ত না। সোনা বা রূপা প্রথমে ওজন ক'রে ক'রে কেনা বেচা হত। এতে অসুবিধা ছিল এই যে, সোনা বা রূপা খাঁটি কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য

আবার একদল লোকের দরকার হ'ত। এরা প্রত্যেক বার বিনিময়ের সোনা বা রূপা পরীক্ষা ক'রে দিত এবং তার জন্য মজুরী হিসাবে কিছু পেত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য রাষ্ট্র থেকে টাকা তৈরী ক'রে বা'র করতে লাগল। এতে প্রত্যেক বার ওজন করার দরকার থাকল না, আর টাকা খাঁটি কিনা সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ কারও রইল না। এমনি ক'রে সমাজে টাকার চল হ'য়ে গেল। ধীরে ধীরে কাগজের টাকা বেরুল। আমরা আগে দেখেছি, কোন জিনিসের টাকা হ'তে হলে সবাই তা নিতে রাজী থাকা চাই। কাগজের টাকা নিতে বিক্রেতারা রাজী হল, কারণ কাগজের টাকার বদলে গভর্ণমেণ্ট সব সময়ই রূপা বা সোনার টাকা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকল। কাগজের টাকা চালু হবার ফলে যতখানি সোনা বা রূপা গভর্ণমেণ্টের থাকা দরকার তার চাইতে অনেক বেশী টাকা বাজারে ছাড়া সম্ভব হল। কেননা, কাগজের টাকা বা নোটের উপর সবার বিশ্বাস থাকায় খুব কম লোকেই এসে নোটের বদলে সোনা বা রূপা চাইত। এবং এর ফলে অল্প সোনা বা রূপা দিয়ে অনেক টাকার কেনা বেচা করান যেতে লাগল।

টাকার প্রথম কাজ তা' হলে দেখতে পাচ্ছি, দু'টো পণ্যের মাঝখানে থেকে তাদের বিনিময় করান। এ ছাড়া টাকার আরও অনেক কাজ আছে। বাজারে পণ্যের মূল্য টাকায়ই প্রকাশ করা হয়। টাকা সেইজন্য পণ্যের মূল্যের মাপকাঠি।

কিন্তু আমরা আগে দেখেছি এ মাপকাঠিটা খুব ভাল মাপকাঠি নয়, কারণ এটা সব সময় একই থাকে না, ওঠা নামা করে। এই মাপকাঠিটাকে বলা হয় "দাম"। এ ছাড়া টাকার আর এক কাজ হচ্ছে মূল্য জমা ক'রে রাখা। পণ্য জমা ক'রে রাখলে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে এবং নষ্ট হয়ে গেলে পণ্যের আর কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু পণ্যকে যদি টাকায় রূপান্তরিত করে রাখা যায় তা হলে তার মূল্য নষ্ট হয় না। কারণ টাকার মূল্য নষ্ট হবার ভয় কম। টাকা নিতে সবাই সব সময়ে রাজী থাকবে; এবং যখনই ইচ্ছা টাকাকে আবার পণ্যের সঙ্গে বদল করে নেওয়া যাবে।

টাকার আর একটা কাজ হ'চ্ছে ধারে কেনা বেচার সুবিধা করে দেওয়া। বিনিময় ক'রলে কেনা বেচা এক সঙ্গেই হ'য়ে যায়। কিন্তু টাকা থাকার ফলে ধারে কেনার সুবিধা হয়েছে। কোন পণ্য কিনে বিক্রেতা যদি রাজী হয় তা হ'লে ক্রেতা তখনই দাম না দিয়ে পরে সুবিধা মত দাম দিতে পারে। এই রকম ধারে কেনা বেচার সুবিধা হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বিস্তার হ'য়েছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি টাকার কাজ মোটামুটি চারটে—বিনিময়ের সাহায্য করা, মূল্যের মাপকাঠি হওয়া, মূল্য জমা করে রাখার কাজ করা ও লেনদেনের কাজ করা। টাকা আবিষ্কার হওয়ায় বিনিময়ের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধা হ'য়েছে।

টাকায় যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে অনেক। টাকা একটা জোরদার পাগলা ঘোড়ার মত। তাকে লাগাম দিয়ে বাগ মানানো ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ। একবার যদি বাগের বাইরে চলে যায় ত আর রক্ষা নেই। সমস্ত উৎপাদন-প্রথা একেবারে ওলট পালট করে দেয়। সমাজে মোট যা টাকার দরকার তার চেয়ে বেশী টাকা যদি বার ক'রে দেওয়া হয়, তা'হলে জিনিস পত্রের দাম খুব বেড়ে যায়। একে বলে **দামের স্ফীতি** বা inflation. আবার টাকা কম হ'য়ে গেলে দাম পড়ে যেতে থাকে। একে বলে **দামের সঙ্কোচ** বা deflation. গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের সাহায্য না পেয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। ফলে অজস্র টাকার নোট ছাপিয়ে কনট্রাক্টরদের কলমালিকদের দেওয়া হয় যুদ্ধের জন্য নানা রকম জিনিস-পত্র তৈরী করে দেবার জন্য। কনট্রাক্টররা আবার সেই টাকা বেতন বাবদ মজুর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের দেয়। তারা এই টাকা দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র কিনবার জন্য বাজারে গিয়ে হাজির হয়। এদিকে যুদ্ধের জন্য জিনিস-পত্র তৈরী হ'তে থাকে বলে সমস্ত কল কারখানা যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত থাকে। তাই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র তৈরী হয় খুব কম। ক্রেতা টাকার নোটে পকেট বোঝাই করে বাজারে হাজির হ'লেও দোকানের তাক অধিকাংশই থাকে খালি। তখন ক্রেতাদের ভেতর

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, কে কত বেশী দাম দিয়ে কিনতে পারে। দোকানদাররাও সুবিধে বুঝে দাম হাঁকতে থাকে খুব চড়িয়ে। ফলে, দেখতে দেখতে সব জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে যায়। এই রকম টাকা খুব বেশী ছাপাবার ফলে, জিনিসপত্রের দাম বেশী বেড়ে যাওয়াকেই বলে "দামের স্ফীতি" বা "ইনফ্লেশান"। দামের স্ফীতি হলে ব্যবসাদারদের খুব লাভ হয়। কারণ কোন জিনিস কিনে দু'দিন ঘরে রাখতে পারলেই অনেক বেশী দামে বিক্রয় করা যায়। এর ফলে দামের স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাদাররা যাও সামান্য জিনিস বাজারে থাকে তা আটক ক'রে ফেলে। বেশী দাম পাবে এই আশায় বিক্রি করতে চায় না। ফলে জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে।

ব্যবসাদাররা এই রকম ভাবে লাভ করলেও দামের স্ফীতি হ'লে বেতনভোগী যারা তাদের কষ্টের অবধি থাকে না। কারণ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন বাড়ে না। ফলে আগে হয়ত ১০০'০০ টাকা বেতনে যে সব জিনিসপত্র কিনতে পারত এখন ২৫০'০০ টাকাতেও তা কিনতে পারে না। ফলে, অর্ধাহারে, অনাহারে এদের দিন কাটাতে হয়। এইজন্য দামের স্ফীতির ফলে ব্যবসাদার, পুঁজিবাদী ইত্যাদি ধনিক শ্রেণীরা আরও ধনী হয়ে উঠে, আর যারা গরীব, সামান্য বেতনভোগী, তাঁদের দারিদ্র্য এত বেড়ে যায় যে, দুর্দশার অন্ত থাকে না।

## [ আট ]

# বাড়তি মূল্য

পুঁজিবাদের আগের সমস্ত যুগে জিনিস-পত্র তৈরী হ'ত ব্যবহারের জন্য, বিনিময় করে লাভ করার জন্য নয়। বিনিময় যদিও কিছু পরিমাণে ছিল, কিন্তু তা হ'ত এক পণ্য দিয়ে অন্য পণ্য পাবার জন্য, লাভের আশায় নয়। কিন্তু পুঁজিবাদের যুগে বিনিময়ের উদ্দেশ্য গেল বদলে। প্রধানতঃ বণিকের হাতে বিনিময় একটা লাভ করার উপায়ে পরিণত হয়। আগের সমস্ত যুগে বিনিময় ছিল এই রকম—

**পণ্য—টাকা—পণ্য**

আর এখন পুঁজিবাদের যুগে বিনিময়ের উদ্দেশ্য বদলে গিয়ে হ'ল—

**টাকা—পণ্য—টাকা**

অর্থাৎ টাকা দিয়ে পণ্য কেনা হ'ল, এবং পণ্য বিক্রি করে আবার টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু শেষে যে টাকা পাওয়া গেল তা আগের টাকার চাইতে বেশী। এই বেশী টাকা পাবার জন্যই পুঁজিবাদী কেনা বেচা করল; পণ্য পাওয়া আর বিনিময়ের উদ্দেশ্য থাকল না। বিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য এখন হয়ে দাঁড়াল এই বেশী টাকা অর্থাৎ লাভ। মনে কর, একজন পুঁজিবাদী ১০০.০০ টাকার একটা জিনিস কিনল। তারপর ২০০.০০ টাকায় বিক্রি করল। সুতরাং তার এই বিনিময়ের

ফলে ১০০˙০০ টাকার পুঁজি বেড়ে গিয়ে ২০০˙০০ টাকা হ'ল। অর্থাৎ ১০০˙০০ টাকা বেড়ে গেল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় এইরূপ বিনিময়ের ফলে যে পরিমাণ পুঁজি বেড়ে যায় তাকে বলে **বাড়তি মূল্য**। আমাদের উদাহরণে ১০০.০০ টাকা বাড়তি মূল্য।

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে এই বাড়তি মূল্য কোত্থেকে এল? স্বভাবতঃ মনে হবে কম দামে কিনে বেশী দামে বিক্রি করলেই পুঁজিবাদীরা এই বাড়তি মূল্য পেতে পারে। কিন্তু গোটা সমাজ যদি আমরা ধরি, তা'হলে দেখতে পাব কেনা বেচার ভেতর দিয়ে এই বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না। মনে কর সমাজে তিনজন পুঁজিবাদী ক, খ আর গ কেনা বেচা ক'রছে :—

| নাম | কার কাছ থেকে কিনল | কার কাছে বেচল | কত দামে কিনল | কত দামে বেচল | লাভ(+) ক্ষতি(−) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | ১০০˙০০ | ১১০˙০০ | +১০˙০০ |
| খ | গ | ক | ১০০˙০০ | ১০০˙০০ | ০ |
| গ | ক | খ | ১১০˙০০ | ১০০˙০০ | −১০˙০০ |

ক + খ + গ মিলে মোট লাভ..................

ক "খ"য়ের কাছ থেকে কিনল ১০০˙০০ টাকায় এবং "গ"য়ের কাছে বেচল ১১০˙০০ টাকায়; তাতে তার লাভ হ'ল ১০˙০০

টাকা। খ "গ"য়ের কাছ থেকে কিনল, মনে কর ১০০·০০ টাকায়; আগেই দেখেছি, সে "ক"য়ের কাছে বিক্রি করেছে ১০০·০০ টাকায়। কাজেই তার লাভ হ'ল না কিছুই। গ, আগেই দেখেছি, "ক"য়ের কাছ থেকে ১১০·০০ টাকায় কিনেছে এবং "খ"য়ের কাছে ১০০·০০ টাকায় বিক্রি করেছে। কাজেই তার বরং লোকসান হ'ল। মোট তিন জনের কেনা বেচা মিলে বাড়তি মূল্য কিছু হ'ল না। কেনা বেচার ভেতর দিয়ে শুধু "গ"য়ের পকেট থেকে টাকা গিয়ে "ক"য়ের পকেটে হাজির হ'ল। বিনিময়ের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি পায় না, শুধু হস্তান্তর হয় মাত্র। অথচ আমরা চোখের সামনে দেখছি, গোটা সমাজে মোট পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন পুঁজিবাদী লোকসান দিয়ে দেউলিয়া হ'য়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সমগ্র পুঁজিবাদীরা মোট তাদের পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়ে ফেলেছে। কেনা বেচার ভেতর দিয়ে মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির কোন কারণ আমরা খুঁজে পাইনে। কেনা বেচার ভেতর দিয়ে কারও কারও লোকসান হ'চ্ছে, কিন্তু যে পরিমাণ তার লোকসান হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ অপর একজনের লাভ হচ্ছে। কাজেই মোট পুঁজির পরিমাণ ঠিক থেকে যাচ্ছে। তা'হলে মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে কোত্থেকে এবং কি ক'রে?

মোট পুঁজির মূল্য বাড়াতে হ'লে পুঁজিবাদীকে এমন পণ্য খুঁজে বার করতে হবে, যা কিনে পুঁজিবাদী তার মূল্য বাড়িয়ে

ফেলতে পারে। যদি কোন কৌশলে তার মূল্য বাড়িয়ে ফেলতে পারে তা'হলে তা যখন বিক্রি করবে তখন তা থেকে কেনা মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য পাবে।

কাজেই কেনা বেচার ভিতর দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ভাবে হলেও সমাজগত ভাবে হতে পারে না। সুতরাং বাড়তি মূল্যের সূত্র বিনিময়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগেই বলেছি, এর জন্য এমন পণ্য দরকার হবে যা কিনে পুঁজিবাদী তার মূল্য বাড়িয়ে ফেলতে পারে।

একমাত্র পণ্য যার মূল্য এ রকম ভাবে বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব, তা হচ্ছে **শ্রমশক্তি**। পুঁজিবাদী যুগে শ্রমশক্তি এই রকম একটা পণ্যে পরিণত হয়। শ্রমিকের একটা শরীর থাকে সুতরাং তার শ্রমশক্তি অর্থাৎ পরিশ্রম করার ক্ষমতাও থাকে। শ্রমিকের বাঁচবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। তাই তার একমাত্র যা সম্বল তাই সে বিক্রি করে। অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি কলমালিকের কাছে বিক্রি করে। কলমালিক এই শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে তা খাটায়। শ্রমশক্তি যখন কাজে লাগান হয় তখন তাকে বলে **পরিশ্রম**। শ্রমশক্তি ও পরিশ্রম বা শ্রমের ভেতর পার্থক্য ভাল করে বোঝা দরকার। এরোপ্লেনের উড়বার শক্তি আছে। কিন্তু ঠিক ওড়া ও উড়তে পারার মধ্যে পার্থক্য অনেক। তেমনি শ্রমিক কাজ করুক আর নাই করুক তার পরিশ্রম করার একটা ক্ষমতা আছে। এই শক্তিটাই শ্রমশক্তি। যখন সে এই শক্তিটা ব্যবহার করে

তখনি তা হয় পরিশ্রম। শ্রমশক্তি একটা পণ্য এবং মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে এই পণ্য কেনে। এই পণ্যের মূল্য কি ক'রে ঠিক হয়? অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতই এরও মূল্য ঠিক হয়। তার মানে এই পণ্য তৈরী ক'রতেও যতখানি সামাজিক ভাবে আবশ্যকীয় পরিশ্রম দরকার তা দিয়ে এর মূল্য ঠিক হয়। অর্থাৎ শ্রমিককে বেঁচে থাকতে হ'লে ও তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বাঁচাতে হ'লে কতকগুলো পণ্য তাকে কিনতে হয়, যেমন ভাত, ডাল, কাপড়-চোপড়, ঘরবাড়ী, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ, ওষুধপত্রের খরচ ইত্যাদি। এসবের যত মূল্য শ্রমিকের শ্রম-শক্তির মূল্যও তত হবে। অর্থাৎ যে রকম শ্রমশক্তি সে বিক্রি করে সেই রকম শ্রমশক্তি তৈরী ক'রতে যা খরচপত্র হয়, তাই দিয়ে শ্রমশক্তির মূল্য ঠিক হয়। মনে কর, কোন একজন শ্রমিক ১০ ঘণ্টা খাটে। এই দশ ঘণ্টা খাটুনীতে তার শরীরের মাংসপেশী, স্নায়ু ইত্যাদি কিছুটা ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণ করতে হ'লে তাকে কিছুটা খাবার খেতে হবে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম নিতে হবে। এই রকম ভাবে উপযুক্ত খাওয়া পরা ও থাকা পেলেই সে ১০ ঘণ্টা কাজ করার মত শ্রমশক্তি অর্জন করতে পারবে। সুতরাং এই দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করার মত শক্তি অর্জন করতে হ'লে যতখানি মূল্যের জিনিসপত্র তাকে খরচ করতে হবে, তার শ্রমশক্তির মূল্যও ততখানি হবে। যদি তার মোট দৈনিক এক টাকা খরচ করতে হয়, তা হ'লে তার একদিনের শ্রমশক্তির

মূল্য হবে এক টাকা। এখানে বলা প্রয়োজন যে শ্রমিক শুধু নিজের শরীরের জন্যই যেটা খরচ করে কেবল সে খরচটাই তার শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণ করে তা নয়। তার পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচার যে অংশটা তার বহন করতে হয় সেটাও এই খরচার ভেতর ধরতে হবে। কেননা সে যদি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচা না পায় তা হ'লে শ্রমিকদের বেঁচে থাকা ও ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করা হবে না। অর্থাৎ তারা সব মরে যাবে। তাহ'লে পুঁজিবাদীরা মজুরের অভাবে উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। শ্রমিকদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার সবটাই অবশ্য শ্রমিকদের বহন করতে হয় না। কারণ তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এবং শিশুরাও ছোটবেলা থেকেই আয় ক'রে নিজেদের ভরণ-পোষণের একটা অংশ গ্রহণ করে। মোটামুটি ভাবে আমরা বলতে পারি যে, শ্রমিকের একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে তার ও তার পরিবারবর্গের একটা অংশের একদিনের ভরণ-পোষণের মোট খরচা দিয়ে। এই খরচা যত বেশী হবে শ্রমশক্তির মূল্যও তত বেশী হবে এবং এই খরচা যত কম হবে শ্রমশক্তির মূল্যও তত কম হবে। এই কারণে চালের দাম বাড়লে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরীও বাড়ে। কারণ চালের দাম বাড়লে তাদের ভরণ-পোষণের খরচাও বেড়ে যায় এবং তার ফলে একদিনের শ্রমশক্তি তৈরী করতে তাদের বেশী খরচ করতে হয়।

পুঁজিবাদী যুগে কুটীরশিল্পী ও চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে

উৎপাদন-যন্ত্র ( যেমন, জমি, তাঁত, ইত্যাদি ) সমস্ত খুইয়ে বসে। ফলে তারা সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। জায়গা, জমি, ঘরদোর সব বিক্রি করে তখন তারা নিরুপায় হয়ে কারখানায় গিয়ে কাজ নেয়। সব কিছু দেনার দায়ে কিংবা জমিদার, মহাজনের অত্যাচারে খুইয়ে দিলেও তাদের শরীরটা কিন্তু তাদেরই থাকে। দাস-প্রথার সঙ্গে পুঁজিবাদী প্রথার এইখানে তফাৎ। দাস-প্রথায় শ্রমিকদের নিজের শরীরের উপর তার নিজের কোন অধিকার নেই; তাই শরীরও তার মালিকের। ফলে মালিক তার শরীরের ভরণ-পোষণের ভার বহন করত। এবং তার শরীর রোগা হ'য়ে গেলে মালিকদের লোকসান হ'ত। কিন্তু পুঁজিবাদী প্রথায় শ্রমিকরা স্বাধীন শ্রমিক; কাজেই তার শরীর রক্ষা করার দায়িত্ব তার নিজের। মালিক তার কাছ থেকে দাস-প্রভুদের মত তার শরীরটা কিনে নেয় না; কিনে নেয় তার একদিনের পরিশ্রম করার ক্ষমতা অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের এই চুক্তি হয়: মজুর একদিন তার কারখানায় খাটবে এবং মালিক তাকে এই একদিনের শ্রমশক্তির যা মূল্য তাই দেবে। এইরূপে মালিকেরা চুক্তি ক'রে শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের শ্রমশক্তি কিনে নেয় এবং যেহেতু এই শ্রমশক্তিই তাদের একমাত্র সম্পদ তাই মজুরেরাও এই শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয় বাঁচার তাগিদে।

কিন্তু শ্রমশক্তির একটা অদ্ভুত গুণ আছে যা আর কোন

পণ্যের নেই। তা হচ্ছে এই যে—একদিনের শ্রমশক্তির যা মূল্য শ্রমশক্তি ব্যবহার ক'রে তা'র চাইতে অনেক বেশী মূল্য সৃষ্টি করা যায়। মনে কর, একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য এক টাকা ; কিন্তু শ্রমশক্তি ব্যবহার ক'রে এক টাকার অনেক বেশী মূল্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রমিক একদিনের পরিশ্রমে যে শুধু নিজেদের একদিনের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করার মত মূল্যই তৈরী করতে পারে তা নয়, তার চাইতে অনেক বেশী পারে। শ্রমশক্তির এই গুণটা আছে বলেই মালিকেরা শ্রমশক্তি ব্যবহার ক'রে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করতে পারে।

এবারে কি করে ম্যাজিকের মত বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয় তাই আমরা দেখব : মনে কর, একটা কাপড়ের কলের মালিক কাপড় তৈরীর জন্য আট ঘণ্টা কাজ করার চুক্তিতে এক টাকা দরে শ্রমশক্তি কিন্‌ল। কিন্তু শ্রমশক্তি থাকলেই চলবে না ; তাকে সূতো, অন্যান্য কাঁচামাল ও কলকব্জা কিন্‌তে হবে। এই সব কিনে সে কাজ আরম্ভ করল। কাপড় যা তৈরী হ'ল তাতে সূতোর যা মূল্য ছিল, তা তৈরী কাপড়ের ভেতর চলে গেল, কলকব্জারও কিছুটা ক্ষয় হ'ল এবং সেই মূল্যটাও কাপড়ের ভেতর চলে গেল। এসবেও কিন্তু নূতন মূল্য কিছু সৃষ্টি হ'ল না। আগেরই সৃষ্ট মূল্য, যা কলকব্জার ও সূতোর মধ্যে ছিল এখন তা কাপড়ের ভেতর চলে এল। নূতন মূল্য যা সৃষ্টি হ'ল সেটা শ্রমশক্তি ব্যয় করেই হল। কারণ শ্রমশক্তিই

একমাত্র পণ্য যা ব্যবহার করলে মূল্য সৃষ্টি হ'তে পারে। এবং শুধু যে মূল্য সৃষ্টি হ'তে পারে তা নয়, শ্রমশক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, নিজের যা মূল্য তা সৃষ্টি ক'রে আরও অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। আট ঘণ্টা যদি শ্রমিক কলে কাজ করে, তবে হয়ত চার ঘণ্টার ভেতরেই সে তার নিজের শ্রমশক্তির যা মূল্য, মানে যা সে মজুরি পায়, তা তৈরী করে ফেলতে পারে। বাকী চার ঘণ্টা সে কল মালিকের জন্য কাজ করে এবং এই বাকী চার ঘণ্টার পরিশ্রমে যে মূল্য তৈরী হয় সেটা কল মালিকেরই থেকে যায়। তার জন্য শ্রমিক মজুরী পায় না। এটাই হ'ল বাড়তি মূল্য।

মনে কর একটি শ্রমিক চার ঘণ্টার পরিশ্রমে শ্রমশক্তির যা মূল্য তা তৈরী ক'রে ফেলে, অর্থাৎ এক টাকা মূল্য তৈরী ক'রে ফেলে। তার মানে প্রত্যেক শ্রমিক ঘণ্টায় ২৫ পয়সার মূল্য তৈরী করে। আরও মনে কর, ঘণ্টায় সুতো ইত্যাদির যে মূল্যটা কাপড়ের ভেতর চলে যায় তা ১৩ পয়সার সমান। আর কলকব্জার যে মূল্যটা কাপড়ের ভেতর চলে যায় তা ১২ পয়সার সমান। তাহলে ঘণ্টায় যে পণ্য তৈরী হয় তার মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে—

পরিশ্রম—২৫ পয়সা
সুতো ও কাঁচামাল—১৩ „
কলকব্জা—১২ „

---

মোট…৫০ পয়সা

অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ৫০ পয়সার মূল্য তৈরী হয়। সুতরাং ৮ ঘণ্টায় ৪'০০ টাকার মূল্য তৈরী হবে। কল মালিকের দৈনিক ৮ ঘণ্টায় খরচা হবে কত?

মজুরী—১'০০ টাকা
সুতো ও কাঁচামাল—১'০৪ „
কলকব্জা— '৯৬ „

মোট···৩'০০ টাকা

অর্থাৎ কল মালিক ৩'০০ টাকার পুঁজি খাটিয়ে ৪'০০ টাকার মূল্য তৈরী করাতে পারবে। সুতরাং প্রত্যেক শ্রমিকের উপর দৈনিক তার একটাকা ক'রে লাভ থাকবে। যদি তার কারখানায় ৫০০ শ্রমিক থাকে, তাহলে দৈনিক সে ৫০০'০০ টাকার বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করতে পারবে। তা'হলে দেখতে পাচ্ছি শ্রমশক্তি নিজের মূল্যের চাইতে বেশী যে মূল্যটা সৃষ্টি করে, সেইটাই হচ্ছে মালিকের লাভ। দিনের ভিতর কয়েক ঘণ্টা খেটে শ্রমিক তার নিজের মজুরীর সমান মূল্য তৈরী ক'রে ফেলে, আর বাকী ক'ঘণ্টা সে যে মূল্য সৃষ্টি করে সেটা থেকেই মালিকের বাড়তি মূল্য উঠে আসে।

[ নয় ]

## বাড়তি মূল্যের হার

বাড়তি মূল্যের কারণ তাহ'লে দেখতে পাচ্ছি, প্রথম শ্রমশক্তির নিজের মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য তৈরীর ক্ষমতা আছে বলে, এবং দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদীর নিকট শ্রমিকেরা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয় বলে। উৎপাদন যন্ত্রে (অর্থাৎ যে সব জিনিস-পত্রের সাহায্যে পরিশ্রম ক'রে পণ্য উৎপাদন করা যায়, যেমন, জমি, খনি, কারখানা, কলকব্জা, কাঁচামাল, ইত্যাদি) পুঁজিবাদীর একচেটিয়া অধিকার থাকার জন্যে শ্রমিকেরা পুঁজিবাদীর কাছে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কি করে পুঁজিবাদীরা উৎপাদন যন্ত্রে এরূপ একচেটিয়া অধিকার পেল তা আমরা আগের অধ্যায়গুলোয় দেখেছি। কিন্তু উৎপাদন যন্ত্রে একচেটিয়া অধিকার পাবার পর তারা এই বাড়তি মূল্য তৈরীর কাজে উৎপাদন যন্ত্র লাগাতে লাগল। তখনই উৎপাদন যন্ত্র হ'ল পুঁজি। যে কোন উৎপাদন যন্ত্র বাড়তি মূল্য তৈরীর কাজে নিয়োজিত হ'লে তাকে আমরা বলতে পারি পুঁজি। পুঁজিবাদীদের সমর্থক যারা তারা কিন্তু পুঁজির অন্য সংজ্ঞা দেয়। তারা বলে, যে কোন পণ্য উৎপাদনের কাজে লাগলেই তা পুঁজি। এরকম ভাবে পুঁজির সংজ্ঞা দিলে

পুঁজি চিরকাল ধরে ছিল ও চিরকাল থাকবে এইটাই বুঝায়, এবং পুঁজির সঙ্গে উৎপাদন যন্ত্রের কোন পার্থক্য থাকে না। একটা বানর যদি একটা লাঠি দিয়ে ফল পাড়ে, তা'হলে যেহেতু লাঠিটা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং লাঠিটা হবে পুঁজি আর বানরটা হবে একজন সম্ভ্রান্ত পুঁজিবাদী। বানরকে পুঁজিবাদী বলতে বর্তমান পুঁজিবাদীরাও নিশ্চয়ই রাজী হবেন না। উৎপাদন যন্ত্র অবশ্য চিরকাল থাকবে; কিন্তু উৎপাদন যন্ত্রের পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়া অর্থাৎ বাড়তি মূল্য সৃষ্টির কাজ, সমাজের একটা বিশেষ স্তরে এসেই হয়েছে; অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। পুঁজিকে উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখা মানে পুঁজির আসল রূপ লুকিয়ে রাখা এবং এটাকে একটা স্থায়ী অবস্থা বলে চালানো। পুঁজির আসল কাজ হল বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করা এবং এই কাজ দিয়েই তার পরিচয়।

পুঁজিকে আবার দু'রকম ভাগে ভাগ করা যায়—**পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল পুঁজি** ( variable and constant capital ). কল মালিক তার পুঁজি দিয়ে দু'রকম জিনিস কেনে; এক হচ্ছে শ্রমশক্তি আর এক হচ্ছে সুতো, কাঁচামাল, কলকব্জা ইত্যাদি। সুতো, কাঁচামাল, কলকব্জা ইত্যাদির মূল্য যত ছিল ঠিক ততটাই উৎপাদিত পণ্যের ভেতর চলে যায়, এদের মূল্যের কিছু পরিবর্তন হয় না। এইজন্য এদের বলে অপরিবর্তনশীল পুঁজি। পুঁজির অন্য ভাগ যা

শ্রমশক্তির জন্য খরচা হয় তা কিন্তু পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এইজন্য একে বলে পরিবর্তনশীল পুঁজি।

সুতরাং কলমালিক তার মোট পুঁজির যে অংশটা মজুরদের বেতন দিতে খরচ করছে তাকে আমরা বলব—পরিবর্তনশীল পুঁজি। আর যে অংশটা কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদির উপর খরচ করছে তাকে বলব অপরিবর্তনশীল পুঁজি।

আমরা আগে দেখেছি, শ্রমিকেরা নিজেদের শ্রমশক্তির যা মূল্য তার চাইতে যত বেশী মূল্য তৈরী করতে পারে তত বেশী পুঁজিবাদীর বাড়তি মূল্য বাড়ে। শ্রমিকেরা যদি ৮ ঘণ্টা খাটে এবং এই ৮ ঘণ্টার ৪ ঘণ্টায়ই যদি নিজেদের শ্রমশক্তির যা মূল্য তা তৈরী ক'রে ফেলতে পারে, তাহলে আর বাকী ৪ ঘণ্টায় যে মূল্য তৈরী হবে সেই মূল্যটা পুঁজিবাদী আত্মসাৎ করবে। এটাই হল তার বাড়তি মূল্য।

শ্রমিক মোট যতক্ষণ কারখানায় কাজ করে, তাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ হচ্ছে, সেই সময়টা যখন সে তার নিজের শ্রমশক্তির যতখানি মূল্য ততখানি মূল্যের জিনিস-পত্র তৈরী করতে লাগাচ্ছে। আমাদের উদাহরণে, আমরা দেখেছি, শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তির যত মূল্য তত মূল্যের জিনিস-পত্র ৪ ঘণ্টায় তৈরী করছে। এই সময়টাকে আমরা —**আবশ্যকীয় শ্রমসময়** (neccssary labour time ) বলব। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে, অবশিষ্ট সে সময়টা যখন সে কল-মালিকের জন্য বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে। এই সময়টার যত মূল্য সে সৃষ্টি

করে তা সব মালিকের পকেটস্থ হয়। এই বাড়তি মূল্য সৃষ্টির সময়টাকে আমরা **বাড়তি শ্রমসময়** (surplus labour time) বলব।

পুঁজিবাদী কত পরিমাণ বাড়তি মূল্য শ্রমিকদের খাটিয়ে ওঠাতে পারছে, তা নির্ভর করবে—প্রথমতঃ মোট কতখানি সময় মালিক মজুরদের খাটিয়ে নিতে পারছে। যত বেশী ঘণ্টা তাদের খাটাতে পারবে তত বেশী বাড়তি মূল্য তাদের দিয়ে তৈরী করাতে পারবে। দ্বিতীয়ত, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কতখানি লাগছে তার উপর। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় যত বেশী লাগছে, বাড়তি মূল্য সৃষ্টির সময় তত কমে যাবে। ফলে বাড়তি মূল্যও তৈরী হবে কম। এইজন্য পুঁজিবাদীরা চেষ্টা ক'রে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমিয়ে দিতে। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমাবার দুটো উপায় আছে। প্রথম উপায় হচ্ছে, শ্রম-শক্তির মূল্য কমিয়ে দেওয়া। শ্রমশক্তির মূল্য যদি কমিয়ে দিতে পারে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিক নিজের শ্রম-শক্তির মূল্য তৈরী করে নিতে পারে এবং বাকী সময়টা তাকে দিয়ে বাড়তি মূল্য তৈরী করান যায়। মনে কর, শ্রমশক্তির মূল্য দিন এক টাকা। এবং এই এক টাকার মূল্য তৈরী করতে শ্রমিকের ৪ ঘণ্টা সময় দরকার হয়। এখন যদি কোন উপায়ে শ্রমশক্তির মূল্য ৫০ পয়সা করে ফেলা যায়, তাহলে আবশ্যকীয় শ্রমসময় ৪ ঘণ্টার জায়গায় ২ ঘণ্টা ক'রে ফেলা যায়। ২ ঘণ্টার পরিশ্রমেই শ্রমিক তার নিজের মজুরীটা তুলে দিতে পারবে। কাজেই

মোট যে ৮ ঘণ্টা সে কারখানায় খাটছে তার বাকী ৬ ঘণ্টাই সে বাড়তি মূল্য তৈরী ক'রবার জন্য দিতে পারবে।

(ক) এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, কি কৌশলে মালিক শ্রম-শক্তির মূল্য কমিয়ে দিতে পারে? শ্রম-শক্তির মূল্য আমরা দেখেছি, নির্ভর করে ভরণ-পোষণের খরচার উপর। ভরণ-পোষণের খরচা যত বেশী হবে শ্রম-শক্তির মূল্যও তত বেশী হবে, আর ভরণ-পোষণের খরচা যত কম হবে শ্রম-শক্তির মূল্যও তত কম হবে। সুতরাং ভরণ-পোষণের খরচা কম ক'রে দিতে পারলে শ্রম-শক্তির মূল্যও কম ক'রে দেওয়া যায়। ভরণ-পোষণের খরচা আবার নির্ভর করে, শ্রমিকেরা যে সব জিনিস-পত্র কেনে তার দামের উপর, যেমন চাল, ডাল, তেল, নুন, কাপড়, বাড়ীভাড়া ইত্যাদির উপর। এই সব জিনিসের দাম সস্তা করে দিতে পারলে ভরণ-পোষণের খরচাও কমে যায়, এবং ভরণ-পোষণের খরচা কমে গেলে শ্রম-শক্তির মূল্যও কম ক'রে দেওয়া যায়। এই সব জিনিসের দাম সস্তা করে দেওয়া যায়, যদি এই সব জিনিস-পত্র কম পরিশ্রমে তৈরী করান যায়, অর্থাৎ এই সব শিল্পের উন্নতি করান যায় এবং বিদেশ থেকে সস্তায় এই সব জিনিস আমদানী করা যায়। পুঁজিবাদী অর্থ-নীতি প্রথম যখন চালু হয়, তখন ইংলণ্ডে Corn Law নামে একটা আইন ছিল। এই আইন অনুযায়ী বিদেশ থেকে সস্তা দামের শস্য ইংলণ্ডের বাজারে আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। জমি-দাররা এই আইন করেছিল যাতে বেশী দামে শস্য বিক্রী করতে

পারে। কিন্তু এই আইনের ফলে পুঁজিবাদীরা দেখল শস্যের দাম বেশী থাকায় শ্রমিকদের মজুরীও তাদের বেশী দিতে হয়। তাই তারা জোর আন্দোলন ক'রে এই আইন তুলে দিল। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সস্তা হয়ে গেল এবং শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের খরচা খুব কমে গেল। তখন পুঁজিবাদীরা শ্রমিকদের মজুরীও কম ক'রে দিল।

(খ) আবশ্যকীয় শ্রমসময় কমাবার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিলে অল্প সময়ে অনেক বেশী মূল্য সৃষ্টি হয় এবং আবশ্যকীয় শ্রমসময় কমে যায়। পরিশ্রমের ঘনত্ব বাড়াতে হ'লে শ্রমিককে খুব বেশী খাটাতেও হয়, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো খুব দ্রুত চালনা করাতে হয়। কলকব্জা আবিষ্কারের একটা উদ্দেশ্যই থাকে পরিশ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। কলের চাকা শ্রমিকদের ইচ্ছামত ঘোরে না, শ্রমিককেই চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা চালাতে হয়। চাকা যত বেশী ঘোরে শ্রমিককে তত শীঘ্র শীঘ্র হাত পা চালাতে হয়। চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ণ টাইমস্' ছবিতে এই ব্যাপারটা তোমরা দেখে থাকবে। এই অবস্থায় কল মানুষের দাস না হ'য়ে মানুষই কলের দাস হ'য়ে পড়ে। এমনিভাবে নানা প্রকার কলকব্জা আবিষ্কার ক'রে কলমালিক শ্রমের ঘনত্ব বাড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, বাড়তি মূল্যের হার বা শোষণের হার বাড়াবার তিনটি উপায় আছে— (ক) কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া; (খ) শ্রমশক্তির মূল্য

অর্থাৎ মজুরী কমিয়ে দেওয়া; (গ) শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া।

বাড়তি মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়াতে হ'লে, মজুরদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারণ প্রত্যেক মজুরের উপর যদি তার ৫০ পয়সা বাড়তি মূল্য হয়, তা'হলে ১০০০ মজুর থাকলে ৫০০·০০ টাকা বাড়তি মূল্য তৈরী হবে। আর ২০০০ মজুর থাকলে ১০০০·০০ টাকা বাড়তি মূল্য তৈরী হবে। এইরূপে মজুরদের সংখ্যা যত বেশী হবে বাড়তি মূল্যের পরিমাণ তত বেশী হবে।

## [ দশ ]

# মজুরী

আমরা আগে দেখেছি, শ্রমশক্তি বিক্রি করে শ্রমিক যে দাম পায় তাই হ'ল মজুরী। সুতরাং মজুরী হ'চ্ছে শ্রমশক্তির দাম। কিন্তু অন্যান্য পণ্যের মতই শ্রমশক্তির দাম যে শ্রমশক্তির মূল্যের সমান হবে তার কোন মানে নেই। শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরী শ্রমশক্তির মূল্যের চাইতে বেশী হতে পারে, কমও হ'তে পারে। মজুরী শ্রমশক্তির মূল্যের চাইতে বেশী হবে, না কম হবে, না সমান হবে তা নির্ভর করে (১) শ্রমিকদের একতা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার উপর (যদি তারা খুব সংঘবদ্ধ হয় তা হ'লে কলমালিক তাদের শ্রমশক্তির ন্যায্য মূল্য না দিয়ে পারে না। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যদি কাজের জন্য

প্রতিযোগিতা থাকে, তবে কলমালিক সহজেই তাদের মজুরী কমিয়ে মূল্যের চাইতে তার দাম কম ক'রে দিতে পারে); (২) আর কলমালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে কিনা তার উপর।

শ্রমশক্তির মূল্য আবার নির্ভর করে শ্রমিক যে সব জিনিস-পত্র ব্যবহার ক'রতে অভ্যস্ত সেই সব জিনিসের মূল্যের উপর। এক এক শ্রেণীর লোক এক এক রকম ভাবে জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত; তাই তারা যে সব জিনিস-পত্র ব্যবহার করে তাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাদের খাওয়া দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছুই হয় আলাদা। যে যেসব জিনিস-পত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সে সেই সব জিনিস-পত্র না পেলে ভয়ঙ্কর অসুবিধা বোধ করে; এবং এমন মজুরী যদি তাকে দেওয়া হয় যাতে ঐ সব জিনিস-পত্র সে কিনতে পারে না, তা হ'লে সে ঐ কাজ ছেড়ে বেশী বেতনের কাজের জন্যে চেষ্টা ক'রতে থাকে। ঐ সব ব্যবহারের জিনিস-পত্র দিয়ে ঠিক করা হয় তার জীবিকার মান (standard of living). এই জীবিকার মান শুধু যে খাবার দাবার ও পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে ধার্য করা হয় তা নয়; অন্যান্য আরও অনেক জিনিস এর ভেতর ধরতে হয়। কতকগুলো জিনিস থাকে যেগুলো না হ'লে বাঁচা যায় না, যেমন খাদ্য, সাধারণ কাপড়-চোপড় ও ঘরদোর। এগুলোকে বলে বাঁচার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য (necessaries for existence); আর কতকগুলো থাকে

যেগুলোর ব্যবহার লোকে এমন অভ্যাস ক'রে ফেলে যে সেগুলো না হ'লে খুবই অসুবিধা অনুভব করে, যেমন পান, তামাক, বিড়ি, চা ইত্যাদি। এগুলোকে বলে, **অভ্যাসগত আবশ্যকীয় দ্রব্য** (conventional necessaries). আর কতকগুলো থাকে, যেগুলো না হ'লে মরে যায় না বা খুব অসুবিধা কিছু মনে হয় না; কিন্তু সেগুলি হ'লে কাজ করবার ক্ষমতা বেশ বাড়ে, যেমন দুধ, ডিম, মাখন ইত্যাদি। এগুলোকে বলে **কার্যক্ষমতার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য** ( necessaries for efficiency ). এই তিন রকম জিনিসপত্র নিয়ে জীবিকার মান গঠিত হয়। জীবিকার মানের ভেতর শুধু শ্রমিকের নয়, তার পরিবারের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার খরচ ধরতে হবে। শ্রমশক্তির মূল্য এই জীবিকার মান দিয়ে ঠিক হয়।

কলমালিকেরা মজুরী সাধারণতঃ দু'রকম ভাবে হিসেব করে দিয়ে থাকে। এক, কাজের সময় অনুযায়ী, যেমন দিন বা সপ্তাহ বা মাস হিসাবে; দুই পণ্য তৈরী অনুযায়ী। এই দু'রকমের যে রকম ভাবেই দেওয়া হোক শ্রমিককে তাতে বোঝানো হয়, পুরা দিনের মজুরীই সে পেল অথবা যেমন সে কাজ করেছে সেই মত বেতনই পেল। অর্থাৎ এভাবে মজুরী দিলে একটা সময় শ্রমিক যে কলমালিকের জন্য বিনে পয়সায় খেটে দিচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। এমনি ভাবে কলমালিকেরা তাদের শোষণ শ্রমিকের কাছ থেকে লুকোতে পারে।

[ এগার ]

## যান্ত্রিক সংগঠন ও মুনাফার হার

আমরা আগে দেখেছি, পুঁজিবাদী শ্রমশক্তি কিনে তা কারখানায় ব্যবহার ক'রে বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি করে। এই বাড়তি মূল্য শ্রমিকেরা তৈরী ক'রলেও এতে মালিকেরই অধিকার এবং এটাই মালিকের **লাভ বা মুনাফা**। বাড়তি মূল্য বাড়লে মুনাফাও বাড়ে। কিন্তু মুনাফার হার মাপবার সময় কলমালিক শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে বাড়তি মূল্যের তুলনা করে না, তুলনা করে মোট পুঁজির সঙ্গে। এর ফলে মুনাফার হার বাড়তি মূল্যের হারের চাইতে অনেক কম দেখা যায়। মনে কর, একজন কলমালিকের মোট পুঁজি ১০,০০০'০০ টাকা। এই দশ হাজারের মধ্যে ৯,৫০০'০০ টাকাই সে কলকজা, কাঁচামাল ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল পুঁজির জন্য খরচ করল এবং বাকী টাকা শ্রমশক্তি কিনবার জন্য মজুরী হিসাবে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে ব্যয় করল। আরও মনে কর, শ্রমিকেরা যতক্ষণ খাটছে, তার অর্ধেক সময়ে শ্রমশক্তির মূল্য তৈরী করছে। ফলে শ্রমিকেরা মোট যা মূল্য তৈরী করছে তার

অর্ধেক যাচ্ছে তাদের মজুরী হিসাবে এবং অর্ধেক থাকছে কলমালিকের কাছে বাড়তি মূল্য হিসাবে। অর্থাৎ, যদি কলমালিক ৫০০·০০ টাকা খরচ করে মজুরী দেবার জন্য, তা'হলে শ্রমিকেরা আর ৫০০·০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরী করছে। সুতরাং ৫০০·০০ টাকা মজুরীর উপর ৫০০·০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরী হচ্ছে। অর্থাৎ বাড়তি মূল্যের হার শতকরা ১০০·০ টাকা। পরিবর্তনশীল পুঁজির উপর মালিক যত খরচ করেছে সে খরচটা ত উঠে আসছেই, উপরন্তু ঠিক তত পরিমাণই বাড়তি মূল্যও মালিকের পকেটে উঠে আসছে। এই বাড়তি মূল্যের হারটাকে আমরা শোষণের হার বলতে পারি। কেননা, শ্রমিকদের কি পরিমাণ মজুরী দিচ্ছে এবং কি পরিমাণ শ্রমিকদের উৎপন্ন মূল্য মালিক পকেটে পুরছে তা এ থেকে বোঝা যায়।

কিন্তু পুঁজিবাদী মুনাফার হার বার করবার সময় পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে বাড়তি মূল্যের তুলনা করে না। সে দেখে মোট কত সে ব্যবসায় খাটিয়েছিল এবং মোট কত টাকা তার লাভ হয়েছে। অর্থাৎ মোট বাড়তি মূল্যের সঙ্গে সে তার মোট পুঁজি তুলনা করে। আমাদের উদাহরণটি নিলে কলমালিকের মোট পুঁজি খাটছে ১০,০০০·০০ টাকা। মোট বাড়তি মূল্য ৫০০·০০ টাকা। সুতরাং ১০,০০০·০০ টাকায় তার ৫০০·০০ টাকা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৫·০০ টাকা মাত্র তার লাভ। সুতরাং মুনাফার হার

দেখে শ্রমিকেরা কি পরিমাণ শোষিত হ'চ্ছে তা বোঝা যায় না। তা বুঝতে হ'লে আমাদের বাড়তি মূল্যের হার বার করতে হবে।

উৎপাদনের মোট পুঁজির পরিবর্তনশীল অংশের তুলনায় অপরিবর্তনশীল অংশের পরিমাণকে বলে **উৎপাদনের যান্ত্রিক সংগঠন**। যদি পরিবর্তনশীল অংশের তুলনায় অপরিবর্তনশীল অংশ খুব বেশী হয়, অর্থাৎ পুঁজির যে অংশটা মজুরী হিসাবে দেওয়া হয়, তার তুলনায় যে অংশটা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্যে খরচা হয় তা যদি খুব বেশী হয় তা হলে যান্ত্রিক সংগঠন বেশী বলে ধরতে হবে। যত বেশী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হবে এবং তার ফলে উৎপাদন-শক্তি যত বেশী বাড়বে তত যান্ত্রিক সংগঠন বাড়বে। আমাদের উদাহরণে অপরিবর্তনশীল পুঁজি=৯,৫০০'০০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি=৫০০'০০ টাকা। সুতরাং যান্ত্রিক সংগঠন হচ্ছে—$\frac{\text{অপরিবর্তনশীল পুঁজি}}{\text{পরিবর্তনশীল পুঁজি}} = \frac{৯৫০০}{৫০০} = ১৯$।

মুনাফার হার নির্ভর করে (ক) বাড়তি মূল্যের হারের উপর। কারণ বাড়তি মূল্যের হার যত বাড়বে, বাড়তি মূল্য তত বাড়বে এবং বাড়তি মূল্য যত বাড়বে মুনাফা তত বেশী হবে। দ্বিতীয়তঃ, (খ) মুনাফার হার নির্ভর করে যান্ত্রিক সংগঠনের উপর। যান্ত্রিক সংগঠন যত বাড়বে মুনাফার হার তত কমবে, এবং যান্ত্রিক সংগঠন যত কমবে

মুনাফার হার তত বাড়বে। কারণ মুনাফার উৎপত্তি হয় বাড়তি মূল্য থেকে, বাড়তি মূল্য আবার জন্মে শ্রমশক্তি ব্যবহারের ফলে। যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ান মানে অনেক বেশী যন্ত্রপাতি বাড়ানো এবং কম শ্রমশক্তি ব্যবহার করা ও মজুরদের সাহায্য ছাড়া কলেতেই সব কাজ করিয়ে নেওয়া। ফলে মজুরের সংখ্যা কমে যাবে এবং বাড়তি মূল্যের পরিমাণও কমে যাবে। সুতরাং কম শ্রমশক্তি ব্যবহার করা মানে কম বাড়তি মূল্য তৈরী হওয়া। কম বাড়তি মূল্য তৈরী হওয়ায় মুনাফাও কম দেখা যায়। মুনাফার হার নির্ভর করে, বাড়তি মূল্যের হারের উপর এবং অপরিবর্তনশীল পুঁজি ও পরিবর্তনশীল পুঁজির অনুপাতের উপর; বাড়তি মূল্যের হার যত বাড়বে, মুনাফা তত বাড়বে এবং অপরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় পরিবর্তনশীল পুঁজি যত কমবে মুনাফা তত কমবে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে কর, ক, খ ও গ তিন জন কলমালিক পণ্য উৎপাদন করছে। তাদের পুঁজি, যান্ত্রিক সংগঠন ইত্যাদি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

| উচ্চ যান্ত্রিক সংগঠন | মধ্যম যান্ত্রিক সংগঠন | নিম্ন যান্ত্রিক সংগঠন |
|---|---|---|
| ক | খ | গ |
| মোট পুঁজি = ১০,০০০·০০ টাকা | ১০,০০০·০০ টাকা | ১০,০০০·০০ টাকা |
| অপরিবর্তনশীল পুঁজি = ৯,৫০০·০০ টাকা | ৫,০০০·০০ টাকা | ৫০০·০০ টাকা |
| পরিবর্তনশীল পুঁজি = ৫০০·০০ টাকা | ৫,০০০,০০ টাকা | ৯,৫০০·০০ টাকা |
| বাড়তি মূল্যের হার = শতকরা ১০০ টাকা | শতকরা ১০০ | শতকরা ১০০ |
| সুতরাং মোট বাড়তি মূল্য = ৫০০·০০ টাকা | ৫,০০০·০০ টাকা | ৯,৫০০·০০ টাকা |
| সুতরাং মুনাফার হার = $\frac{৫০০·০০}{১০,০০০·০০} \times ১০০$ | $\frac{৫,০০০}{১০,০০০} \times ১০০$ | $\frac{৯,৫০০}{১০,০০০} \times ১০০$ |
| = ৫·০০ টাকা শতকরা | = ৫০·০০ টাকা শতকরা | = ৯৫·০০ টাকা শতকরা |

ক, খ ও গ তিনজনেরই পুঁজি সমান, বাড়তি মূল্যের হারও সমান। কিন্তু প্রত্যেকেরই যান্ত্রিক সংগঠন ভিন্ন। "ক"য়ের যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে বেশী। এর ফলে তার মুনাফার হারও সবচেয়ে কম, মাত্র শতকরা ৫·০০ টাকা। "খ"য়ের যান্ত্রিক সংগঠন "ক"য়ের চাইতে কম, কিন্তু "গ"য়ের চাইতে বেশী। সুতরাং তার মুনাফার হারও "ক"য়ের চাইতে বেশী কিন্তু "গ"য়ের চাইতে কম। আর "গ"য়ের যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে কম বলে তার মুনাফার হার সবচেয়ে বেশী।

যান্ত্রিক সংগঠন কম হওয়ায় "গ" বাড়তি মূল্য তৈরী করে বেশী এবং মুনাফাও বেশী হারে সৃষ্টি করে। কিন্তু এই অতিরিক্ত হারে মুনাফা তার কপালে জোটে না। পণ্য উৎপাদন ক'রে সে এই সব বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু বাজারে বিক্রি না ক'রলে এই সব পণ্য আবার টাকায় রূপান্তরিত হয় না, এবং পণ্যের মূল্য টাকায় রূপান্তরিত করতে না পারলে, তার এত হাঙ্গামার কোন তাৎপর্যই থাকে না। বাজারে এই সব পণ্য যদি ঠিক মূল্যে বিক্রি করতে পারে, তবেই সে বাড়তি মূল্য বাজিয়ে সিন্দুকে তুলতে পারে। বাজারে গিয়ে কিন্তু "গ"কে অসুবিধায় পড়তে হয়—সেখানে "ক" এবং "খ"ও তাদের জিনিস-পত্র নিয়ে হাজির থাকে। ক, খ ও গ মিলে মোট যে পরিমাণ মূল্যের সৃষ্টি ক'রেছে, তা হচ্ছে তিন জনেরই মোট পুঁজি ও মূল্যের সমান। মোট পুঁজি হচ্ছে প্রত্যেকের ১০,০০০·০০ টাকা ক'রে। "ক"য়ের বাড়তি

মূল্য হচ্ছে ৫০০˙০০ টাকা, "খ"য়ের হচ্ছে ৫,০০০˙০০ টাকা, আর "গ"য়ের হচ্ছে ৯,৫০০˙০০ টাকা। মোট বাড়তি মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৫,০০০˙০০ টাকা। তা হ'লে ক, খ ও গ তিন-জনে মিলে মোট মূল্য সৃষ্টি ক'রল ৪৫,০০০˙০০ টাকার। মনে কর মোট ৪৫০০০ পণ্যই তারা সকলে তৈরী করেছে। "ক"য়ের যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে বেশী সুতরাং সে সবচেয়ে বেশী পণ্য তৈরী করবে। "ক"য়ের চাইতে কম করবে "খ" এবং "গ" সবচেয়ে কম পণ্য তৈরী করবে। মনে কর "ক" তৈরী করেছে ২০,০০০, "খ" করেছে ১৫,০০০ এবং "গ" করেছে ১০,০০০। ৪৫,০০০ পণ্য তৈরী হওয়ায় এবং মোট ৪৫০০০˙০০ টাকার মূল্য তৈরী হওয়ায় প্রত্যেক পণ্যের মূল্য হবে ১˙০০ টাকা ক'রে। সুতরাং পণ্য বিক্রি ক'রে "ক"পাবে ২০,০০০˙০০ টাকা, "খ" পাবে ১৫,০০০˙০০ টাকা এবং "গ" পাবে ১০,০০০˙০০ টাকা। অতএব "ক"য়ের লাভ হবে, ১০,০০০˙০০ টাকা ; "খ"য়ের লাভ হবে ৫০০০˙০০ টাকা এবং "গ"য়ের কিছু লাভ হবে না। এখন পরের পৃষ্ঠায় হিসাবটা দেখলে জিনিসটা আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝবে।

| | মোট পুঁজি | বাড়তি মূল্য | মোট উৎ-পাদিত মূল্য | পণ্য | বাজার দাম | পণ্য বিক্রির মোট আয় | পণ্য তৈরীর খরচ | লাভ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১০,০০০·০০ | ৫০০·০০ | ১০,৫০০·০০ | ২০,০০০ | ১·০০ | ২০,০০০·০০ | ১০,০০০·০০ | ১০,০০০·০০ |
| খ | ১০,০০০·০০ | ৫,০০০·০০ | ১৫,০০০·০০ | ১৫,০০০ | ১·০০ | ১৫,০০০·০০ | ১০,০০০·০০ | ৫,০০০·০০ |
| গ | ১০,০০০·০০ | ৯,৫০০·০০ | ১৯,৫০০·০০ | ১০,০০০ | ১·০০ | ১০,০০০·০০ | ১০,০০০·০০ | ০ |
| মোট | ৩০,০০০·০০ | ১৫,০০০·০০ | ৪৫,০০০·০০ | ৪৫,০০০ | | | | ১৫,০০০·০০ |

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি সমাজে মোট ১৫,০০০˙০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরী হয়েছিল। আর এই ১৫,০০০˙০০ টাকার ভেতর "গ" একাই তৈরী করিয়েছে ৯,৫০০˙০০ টাকার। কিন্তু যান্ত্রিক সংগঠন কম হওয়ায় এই বাড়তি মূল্য ভোগ করা আর তার হ'য়ে উঠল না; বাজারের নিয়ম অনুযায়ী "ক"য়ের পকেটে গিয়ে সব হাজির হ'ল।

কি রকম ভাবে "ক" "গ"য়ের তৈরী এই বাড়তি মূল্য পকেটস্থ ক'রল? "ক" ২০,০০০ পণ্য তৈরী করেছে এবং মোট খরচ হ'য়েছে তার ১০,০০০˙০০ টাকা। সুতরাং তার প্রত্যেকটা পণ্যে পঞ্চাশ পয়সা খরচ হয়েছে। কিন্তু বাজারে মোট ৪৫,০০০˙০০ টাকার মূল্য তৈরী হওয়ায় এবং ৪৫,০০০ হাজার পণ্য তৈরী হওয়ায়, প্রত্যেকটা পণ্যের মূল্য হয়েছে ১˙০০ টাকা করে। সুতরাং "ক" প্রত্যেকটা পণ্যে পঞ্চাশ পয়সা লাভ ক'রেছে। এবং ২০,০০০ হাজার পণ্য তৈরী ক'রে তার মোট লাভ হয়েছে ১০,০০০˙০০ টাকা। কিন্তু "গ" মাত্র ১০,০০০ পণ্য তৈরী করেছে এবং প্রত্যেক পণ্য তৈরী ক'রতে তার খরচও পড়েছে ১˙০০ টাকা ক'রে। সুতরাং তার লাভ কিছু হয়নি। এইজন্য বাজারে যে যত সস্তায় যত বেশী পণ্য তৈরী ক'রতে পারবে তার তত বেশী লাভ হবে এবং সে তত বেশী পরিমাণে অপরের উৎপাদিত বাড়তি মূল্য নিজের পকেটস্থ ক'রে ফেলতে পারবে। এই কারণে পুঁজিবাদী উৎপাদনের যান্ত্রিক সংগঠন বাড়াতে এত ব্যগ্র থাকে। আমাদের উদাহরণে "গ" যদি কিছু

বাড়তি মূল্য হাত করতে চায়, তা হ'লে তার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে তার কারখানার যান্ত্রিক সংগঠন খুব শীঘ্র বাড়িয়ে ফেলা। এ যদি সে ক'রতে পারে, তবে সে কিছু লাভ ক'রে টিকে থাকতে পারবে। নতুবা ক ও খ তার তৈরী বাড়তি মূল্য সব নিয়ে নেবে এবং কিছুদিনের ভেতরই তাকে লোকসানের জন্য লালবাতি জ্বালতে বাধ্য করাবে। এইজন্য পুঁজিবাদীরা লাভ যা করে তা খরচ ক'রে না ফেলে তার একটা মোটা অংশ আবার পুঁজি হিসাবে খাটায় এবং যন্ত্রপাতির উন্নতির জন্য ব্যয় করে। এমনি ভাবে পুঁজি বেড়েই চলে।

কিন্তু আমরা আগে দেখেছি, মুনাফার হার নির্ভর করে বাড়তি মূল্যের হারের উপর এবং যান্ত্রিক-সংগঠনের উপর। বেশী বেশী পুঁজি লাগিয়ে যন্ত্রপাতির উন্নতি করা মানেই যান্ত্রিক সংগঠন বাড়িয়ে দেওয়া এবং যান্ত্রিক সংগঠন বাড়া মানে আবার মুনাফার হার কমে যাওয়া। যদিও যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ালে পুঁজিবাদীর ব্যক্তিগত ভাবে অন্যান্য পুঁজিবাদী অপেক্ষা মুনাফা বেড়ে যায়, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে তাদের মুনাফার হার কমে যেতে থাকে। সুতরাং যতই যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ান যায় ততই মুনাফার হার কমে যায়। এই মুনাফার হার ক'মে যাওয়া পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার একটা বিশেষ রীতি।

মুনাফার হার ক'মে যাওয়ার ফলে মোট মুনাফাও ক'মে যেতে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার আসল

উদ্দেশ্য হ'চ্ছে মুনাফা। মুনাফাই যদি ক'মে গেল তা হ'লে আর উৎপাদন ক'রে লাভ কি? কাজেই মোট মুনাফা ক'মে যেতে থাকলেই পুঁজিবাদীরা উৎপাদন কমিয়ে দেবে বা বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু মুনাফার হার কমে গেলেও মোট মুনাফা যাতে ক'মে না যায় তার একটা উপায় করা যায়। সে উপায় হ'চ্ছে মুনাফা যে হারে ক'মে যাচ্ছে, তার চাইতে বেশী হারে পুঁজি বাড়ান। মনে কর, মুনাফার হার প্রথম বছর ছিল শতকরা ৪০·০০ টাকা। তারপর হ'ল ২০·০০ টাকা। তারপর হল ১০·০০ টাকা। পুঁজি যদি হয় ১০০·০০ টাকা তাহলে প্রথম বছরে মোট লাভ হবে ৪০·০০ টাকা। দ্বিতীয় বছরে পুঁজি যদি ডবল করা যায়, অর্থাৎ ২০০·০০ টাকা করা যায় তা'হলে মোট লাভ বজায় থাকে অর্থাৎ ৪০·০০ টাকাই থাকে এবং তার পরের বছর পুঁজি আবার ডবল করলে অর্থাৎ ৪০০·০০ টাকা করলে লাভ ৪০·০০ টাকাই থাকে। সুতরাং এ রকম ৪০·০০ টাকা মোট লাভ রাখতে গিয়েই পুঁজিবাদীকে প্রত্যেক বছর পুঁজি ডবল বাড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু ১০০·০০ টাকা পুঁজি খাটিয়ে যা পাচ্ছিল, ২০০·০০ টাকা এবং ৪০০·০০ টাকার পুঁজি খাটিয়ে যদি সেই ৪০·০০ টাকাই পায়, তা হলে আর তার পুঁজি বাড়িয়ে লাভ কি? কাজেই দ্বিতীয় বছর ২০০·০০ টাকার বেশী পুঁজি তাকে বাড়াতে হবে। তা হলেই ৪০·০০ টাকার চাইতে মুনাফা কিছু বেশী হবে। এবং তৃতীয় বছর ৪০০·০০ টাকার বেশী পুঁজি বাড়াতে হবে। সুতরাং দেখতে

পাচ্ছি পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার অস্তিত্ব তা হ'লে নির্ভর ক'রছে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর বেগে পুঁজি বাড়িয়ে যাওয়ার উপর।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার সঙ্কটও এই পুঁজি বাড়ান থেকে আসে। কারণ পুঁজি বেড়ে যাওয়ায় যান্ত্রিক-সংগঠনও বেড়ে যায় এবং তার ফলে মুনাফার হার আবার ক'মে যেতে থাকে। এবং যতই মুনাফার হার ক'মে যায়, মুনাফা বজায় রাখার জন্য পুঁজি তত বাড়িয়ে দিতে হয়। **এই হ'ল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার সঙ্কট।** মুনাফার হার কমে গেলে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হয় আর পুঁজির পরিমাণ যতই বেড়ে যায়, মুনাফার হারও ততই ক'মে আসে। কিন্তু পুঁজি বাড়াবারও একটা সীমা আছে। যখনই পুঁজি বাড়ান থমকে দাঁড়ায় তখনই উৎপাদন-প্রথার ভেতরেও অচল অবস্থা এসে যায়। অনেক কারখানা বন্ধ হ'য়ে যায়, অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে প'ড়ে। একেই বলে **ব্যবসা-সঙ্কট।**

উৎপাদিত পণ্য কলমালিক নিজে বাজারে বিক্রি করে না। ব্যবসায়ীদের উপর বিক্রির ভার থাকে এবং এর জন্য বাড়তি মূল্যের একটা অংশ ব্যবসায়ীকে দিতে হয়। কত অংশ দেবে তা প্রতিযোগিতার উপর এবং পণ্যের আমদানী ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

## [ বারো ]

# সুদের হার ও ব্যাঙ্ক

লোকে সাধারণতঃ তাদের যা আয় ( মুনাফার থেকে হ'ক আর শ্রমশক্তি বিক্রি করেই হ'ক ) তার সবটা খরচ করে ফেলে না, একটা অংশ বাঁচিয়ে জমা করে রাখবার চেষ্টা করে। যাদের আয় খুব কম, তাদের পক্ষে অবশ্য বাঁচান সম্ভব হয় না। কিন্তু আয় একটু বেশী হলেই কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অধিকাংশ লোকে করে থাকে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লোকে টাকা জমায়। যাদের কোটি কোটি টাকা আয় তারা খরচ করার উপায় পায় না বলেই জমায়। পৃথিবীতে মোট প্রত্যেক বছর যত টাকা জমে তার অধিকাংশ এদের কাছে জমা হয়। খুব ছোট একটা অংশ জমে এমন লোকদের কাছে যাদের আয় কম হলেও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই যারা জমায়। হঠাৎ বেকার হয়ে গেলে বা একটা অসুখ-বিসুখে পড়লে যাতে একেবারে অসহায় হয়ে না পড়ে তার জন্যই এ সব লোকেরা টাকা পয়সা কিছু জমাবার চেষ্টা করে।

টাকাটা জমিয়ে আজকাল লোকে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে রাখে। ব্যাঙ্কে রাখলে টাকাটা যেমন চোর ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদে থাকে তেমনি কিছু সুদও ব্যাঙ্ক দিয়ে থাকে। এই টাকাটাকে বলে জমা বা আমানত ( deposit ).

ব্যাঙ্ক কিন্তু এ টাকাটা সিন্দুকে ফেলে রাখে না। ব্যাঙ্ক এ টাকাটা ব্যবসায়ী, কলমালিকদের ধার দেয়। আমানতকারীকে যে সুদ তার জমার উপর ব্যাঙ্ক দেয়, তার চাইতে বেশী সুদে কলওয়ালাকে সে ধার দেয়। এই সুদের যে কমবেশী, তার থেকেই ব্যাঙ্কের লাভ হয়। কলমালিক ও ব্যবসাদাররা এই টাকাটা নিয়ে ব্যবসায় খাটায়। কলমালিক শ্রমশক্তি ক্রয় ক'রে ও শোষণ ক'রে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে তার থেকেই ব্যাঙ্কের সুদ দেয়।

সুদের হার ঠিক হয় কলমালিকের পুঁজির চাহিদা ও ব্যাঙ্কে আমদানির পরিমাণ দিয়ে। যদি কলমালিকরা দেখে যে পুঁজি খাটিয়ে বেশ ভাল মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে, তা হ'লে তারা আরও বেশী পুঁজি খাটাতে চায় এবং ফলে ব্যাঙ্কগুলো সুবিধা পেয়ে সুদের হার বাড়িয়ে দেয় এবং বাড়তি মূল্যের একটা মোটা অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন কলমালিকরা দেখে মুনাফা পড়ে যাচ্ছে, তখন তারা আর বেশী পুঁজি খাটাতে চায় না। ফলে পুঁজির চাহিদা ক'মে যায় বলে ব্যাঙ্কে জমা টাকা পড়ে থাকে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকলে ব্যাঙ্কের লোকসান, কারণ যারা জমা রাখে তাদের গচ্ছিত টাকার সুদ দিতে হয়। কাজেই ব্যাঙ্ক তখন সুদের হার কমিয়ে দেয়, যাতে কলমালিকরা সুদ কম দেখে টাকা ধার নেয়।

তেমনি ব্যাঙ্কে অনেক বেশী টাকা যদি লোকে জমা দেয়, তা হ'লে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে যে সুদ দেয় তা কমিয়ে দেয়।

তাতে ব্যাঙ্কে কম টাকা জমা হয়। সেরূপ হলে সুদের হার ব্যাঙ্ক আবার বাড়িয়ে দেয়। এমন ক'রেই বাড়তি মূল্যের কত অংশ ব্যাঙ্ক পাবে, আর কত অংশ পুঁজির আসল মালিক অর্থাৎ আমানতদার পাবে তা ঠিক হয়।

ব্যাঙ্কের কাজ যে শুধু ধার দেওয়া বা আমানত রাখা, তা নয়। ব্যাঙ্কের আর একটা বড় কাজ হচ্ছে ক্রেডিট চালু করা। টাকা জমা দেবার পর ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একটা চেক বই দিয়ে দেয়। আমানতকারী কোনও জিনিস কিনে তার দাম চেকে লিখে নাম সই ক'রে দিলে বিক্রেতা জিনিসের দামের জন্য নগদ টাকা চায় না, চেক্ পেয়েই খুশী হয়। চেক্‌টা হ'চ্ছে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর একটা হুকুম, যে টাকা লেখা থাকবে তাতে সেই টাকা চেক্ যার নামে থাকবে তাকে দেবার জন্য। বিক্রেতা এই চেক্ পেয়ে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়। এবং ব্যাঙ্ক আমানতকারীর জমা টাকা থেকে কেটে চেকে যত টাকা লেখা থাকে তত টাকা বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়। বিক্রেতার যদি টাকার দরকার না থাকে, তা হ'লে ঐ টাকা ব্যাঙ্কেই নিজের নামে জমা রেখে দিতে পারে। ব্যাঙ্ক তখন আমানতকারীর জমা টাকা থেকে কেটে সেই টাকাটা বিক্রেতার নামে জমা করে রাখে।

এই চেক্ দিয়ে কেনা বেচার নাম **ক্রেডিটে কেনা বেচা**। চেকে যারা কেনা বেচা করে তাদের অধিকাংশেরই ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকে এবং কিছু বিক্রি ক'রে চেক্ পেলেই তা

ব্যাঙ্কে জমা করতে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে চেকে যত টাকার কেনা বেচা হয় তার অধিকাংশতেই টাকা তোলা হয় না। নগদ টাকা ছাড়াই এই সব কেনা বেচা হ'য়ে যায়। ব্যাঙ্ক শুধু ক্রেতার জমা থেকে কেটে বিক্রেতার হিসাবে জমা ক'রে দেয়। এর ফলে এক দিকে কেনা বেচার যেমন সুবিধা হয়, তেমনি আবার টাকাও কেনা বেচার জন্য কম লাগে।

এই ক্রেডিট চালু রাখার ফলে ব্যাঙ্ক যা টাকা জমা পায় তার চাইতে অনেক বেশী টাকা ধার দিতে পারে। কারণ চেকে কেনা বেচা হয় বলে টাকার খুব কম দরকার হয়। যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেয় তাকে শুধু একটা চেক বই দিয়ে দিলেই হয়। সে জিনিস-পত্র কিনে চেকে দাম দিয়ে দেয় এবং চেক এসে আবার ব্যাঙ্কে বিক্রেতার নামে জমা হয়। এর ফলে ব্যাঙ্ক এক পয়সা না রেখেও হাজার হাজার টাকা ধার দিতে পারে। এই রকম খালি সিন্দুক থেকে হাজার হাজার টাকা ধার দিয়েই ব্যাঙ্কের আয় সব চেয়ে বেশী হ'য়ে থাকে।

কিন্তু ব্যাঙ্কের সিন্দুক একেবারে খালি করলেও চলে না। কেন না, সব চেক যে জমা হবার জন্যে আসে তা নয়। কিছু কিছু চেক জমা টাকা তুলবার জন্যও আসে। এই সব চেকের মালিকরা এসে টাকা চায়। ব্যাঙ্ক যদি তখন টাকা না দিতে পারে, তা হলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেধে যায়। চারিদিকে রটে যায় যে, ব্যাঙ্ক জমা টাকা দিতে পারছে না। অমনি দেখতে

দেখতে হাজার হাজার লোক, যারা সেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখেছে, তারা টাকার দুশ্চিন্তায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাঙ্কের দুয়ারে এসে হাজির হয় এবং এসেই তাদের টাকা দাবী করে। ব্যাঙ্ক জমা টাকার অধিকাংশ ধার দিয়ে দেয়, কাজেই জমা টাকা ফেরৎ দিতে পারে না। হয়ত তাকে অন্য ব্যাঙ্কের কাছে ছুটতে হয় টাকা ধারের জন্য, নয় গভর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু ধার বা সাহায্য যদি না পায়, তা হলে বাধ্য হয়েই তাকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিতে হয়। সেইজন্য ব্যাঙ্ক সব সময় কিছু পরিমাণে টাকা সিন্দুকে জমা রেখে দেয়, যাতে আমানতদারদের টাকার চাহিদা সব সময়েই মিটিয়ে তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে পারে। এই টাকাটাকে বলে মজুত টাকা ( reserve )।

## [ তেরো ]

## জমির খাজনা

সমাজের যত রকম উৎপাদন যন্ত্র আছে তার ভেতর জমি বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ মানুষের সবচেয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্য হল খাদ্য, তার অধিকাংশ জমি ছাড়া তৈরী হতে পারে না। অন্যান্য উৎপাদন-

যন্ত্রের সঙ্গে জমির প্রভেদ বিশেষ কিছুই নেই। শুধু প্রভেদ এই যে—জমি ভিন্ন উৎপাদন যন্ত্রে, যেমন কলকব্জায়, মানুষের পরিশ্রমের ভাগ বেশী, আর প্রকৃতিদত্ত জিনিসের ভাগ কম থাকে; কিন্তু জমিতে প্রকৃতিদত্ত জিনিসের অংশ বেশী এবং মানুষের পরিশ্রমের ভাগ কম থাকে। এবং এর ফলে অন্যান্য উৎপাদন যন্ত্র যেমন ইচ্ছে করলেই বাড়িয়ে ফেলা যায়, জমির পরিমাণ ও উর্বরতা তত শীঘ্র শীঘ্র বা সহজে বাড়ান যায় না। কিন্তু তাই বলে জমি একেবারে প্রকৃতির দান, আর কলকব্জা শুধু পরিশ্রম, আর কিছু না, এরূপ বলাও ভুল হবে।

পুঁজিবাদী যুগের বহু পূর্ব থেকেই জমিতে জমিদারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই একচেটিয়া অধিকার থাকার ফলে জমিদার জমি থেকে উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশ আদায় করে থাকে, একেই বলে **জমির খাজনা** (rent). এই খাজনার হার নির্ভর করে কোন্ জমি কত ভাল এবং তাতে কত বাড়তি ফসল তৈরী হ'ল তার উপর। মনে কর, দুখানা জমি 'ক' ও 'খ'। 'ক' জমিটা খুব ভাল আর 'খ' টা খারাপ। দু'টোতেই সমান পরিশ্রম ব্যয় করা গেল। কিন্তু ফসল হ'ল 'ক' জমিটিতে ১০ মণ এবং 'খ' জমিটিতে ৫ মণ। বাজারে 'এই ফসলের এমন দাম হওয়া চাই যাতে 'খ' এর চাষের খরচ ও সাধারণতঃ পুঁজির উপরে যে হারে মুনাফা পাওয়া যায় সেই হারে

মুনাফা উঠে আসে। চাষের খরচার ভেতর শুধু যে বীজ ধান, গরু, লাঙ্গল, সার, জলসেচ ও যাদের দিনমজুর খাটাল তাদের মজুরী এবং ফসল বাজারে আনবার খরচ ধরতে হবে তাই নয়, চাষীর নিজের ও তার পরিবারের যারা ফসল উৎপাদনের কাজে খেটেছে তাদের সকলের মজুরীও ধরতে হবে। এই সব খরচ নিয়ে মনে কর মোট খরচ হয়েছে ২৩·০০ টাকা, এবং চাষী এই ২৩·০০ টাকার মুনাফা ২·০০ টাকা আশা করে। সুতরাং এই ৫ মণ ফসল বিক্রি ক'রে তার এই ২৫·০০ টাকার খরচাটা উঠে যাওয়া চাই। অর্থাৎ বাজারে ফসলের দাম মণ প্রতি ৫·০০ টাকা হওয়া চাই। দাম ৫·০০ টাকার কম হলে চাষীর এ জমি চাষ করে লোকসান হবে, ফলে এ জমি চাষ করা সে ছেড়ে দেবে। যদি দাম ৫·০০ টাকার বেশী হয় তা হলে এ জমির চাইতে খারাপ জমি চাষ করেও সে লাভ করতে পারবে। তাতে ফসল কম হবে কিন্তু দাম বেশী হওয়ায় সে জমি চাষের খরচ পুষিয়ে যাবে। মনে কর ফসলের দাম ৫·০০ ক'রে। তা হলে 'খ' জমিখানা থেকে চাষীর আয় হবে মোট ২৫·০০ টাকা। 'ক' জমি যার তার আয় হবে ১০ মণ ফসলে ৫০·০০ টাকা। অর্থাৎ 'ক' জমির চাষীর বাড়তি আয় হবে ২৫·০০ টাকা।

কিন্তু এই ২৫·০০ টাকা সে রাখতে পারবে না। কারণ অন্যান্য চাষীরাও এই জমিখানা নেবার জন্য জমিদারকে ধরাধরি করতে থাকবে এবং যে বেশী খাজনা দিতে চাইবে

জমিদার তাকেই জমিটা দেবে। চাষীদের ভেতর এই প্রতিযোগিতার ফলে জমির খাজনা ২৫·০০ টাকা অবধি উঠে যাবে। ২৫·০০ টাকার বেশী উঠবে না, কারণ তাহলে চাষীর আয় ২৫·০০ টাকার কম হয়ে যাবে এবং তার লোকসান হবে। ফলে সে হয় অন্য জমি চাষ করবে, নয় তার পুঁজি ২৩·০০ টাকা অন্য ভাবে খাটাবে।

কিন্তু খাজনা বাড়তি আয়ের সমান থাকে তখনই যখন (১) চাষীদের ভেতর প্রতিযোগিতা থাকে, (২) জমিদার খাজনা বেশী চাইলে চাষীরা অন্য জমি দেখে নিতে পারে বা অন্য কাজে চলে যেতে পারে। চাষীদের ভেতর সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা যথেষ্ট দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের মত দেশে, যেখানে চাষবাসই হচ্ছে লোকের প্রধান জীবিকা এবং লোকসংখ্যা খুব বেশী। বরং প্রতিযোগিতার প্রচণ্ডতায় চাষীদের ভেতর দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনোখুনি মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকে। কিন্তু চাষীদের অন্য কোনরকম কাজের সুবিধা না থাকলে এবং চাষীদের সংখ্যার তুলনায় জমির অভাব থাকলে জমিদার জমির খাজনা বাড়তি আয়ের চাইতেও বাড়িয়ে দিতে পারে। এ রকম অবস্থায় জমিদার যে শুধু স্বাভাবিক মুনাফার অংশটা নিয়ে নেয় তা নয়, আরও অনেক বেশী দাবী করে; চাষীর বাঁচবার দ্বিতীয় উপায় কিছু থাকে না বলে নিজের আয় থেকে জমিদারকে এই অংশটা তাকে দিতে হয়। এর ফলে তার বাঁচবার জন্য

সবচেয়ে যত কম আয় দরকার তাও তার থাকে না এবং সে জন্যই কিছুদিনের ভেতর সে দেনায় ডুবে যেতে বাধ্য হয়।

পুঁজিবাদের যুগে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ার ফলে ও ব্যবসা-সঙ্কটের ফলে হাজার হাজার লোক বেকার থাকতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় চাষীরা যে অন্য কাজের দিকে চলে যাবে তা আর সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়েই তাদের চাষের কাজে থাকতে হয়। এই সুযোগ নিয়ে জমিদার তার শোষণ বাড়িয়ে দেয়, তাই চাষীদের দুরবস্থা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। শুধু যে জমিদারের খাজনা দিয়েই সে নিষ্কৃতি পায় তা নয়; নানা রকম কর তার উপর চাপান হয়। খাজনার ভার, দেনার দায়, জমিদারের কর্মচারীদের বেআইনী আদায় ইত্যাদির বোঝা, আর হাজার হাজার রকমের শোষণ চাষীর জীবনকে দুঃসহ করে তোলে।

## [ চোদ্দ ]

## ব্যবসা-সঙ্কট ও বেকার

যে কোন রকম সমাজই হ'ক না কেন, তাতে বেঁচে থাকতে হ'লে শুধু একবার জিনিস-পত্র উৎপাদন ক'রে শেষ ক'রে দিলে চলে না, বারে বারে উৎপাদন দরকার হয়। কারণ জিনিস-পত্র

একদিকে যেমন উৎপাদিত হ'তে থাকে তেমনি আবার তা ব্যবহৃতও হ'তে থাকে এবং ব্যবহার হ'তে হ'তে তা ক্ষয়ও হ'য়ে যায়। এই সব জিনিস-পত্র যেমন যেমন ক্ষয় হয়, তেমনই তা আবার পূরণ করা দরকার। উৎপাদন সেইজন্য একটা স্রোতের মত চলতে থাকে। এই রকম বারে বারে উৎপাদনকে বলে **পুনরুৎপাদন**। পুনরুৎপাদন দু'রকম হ'তে পারে,—**সরল পুনরুৎপাদন** এবং **বর্ধিত পুনরুৎপাদন**। যে পরিমাণ জিনিস-পত্র প্রতি বৎসর ক্ষয় হ'য়ে যায়, শুধু সেই পরিমাণ জিনিস-পত্রই যদি তৈরী হয় তা হ'লে তাকে বলে সরল পুনরুৎপাদন। আর যদি উৎপাদন তার চাইতে বেশী হয় এবং প্রত্যেক বছর বেড়ে যেতে থাকে, তা হ'লে তাকে বলে বর্ধিত পুনরুৎপাদন। যে সব সমাজ বহুদিন ধরে সভ্যতার একই স্তরে রয়েছে সেই সব সমাজেই শুধু সরল উৎপাদন দেখা যায়। সরল উৎপাদন সেইজন্য সমাজের রীতি নয়, বর্ধিত উৎপাদনই সাধারণতঃ সমাজে হ'য়ে থাকে।

সরল উৎপাদনই হোক আর বর্ধিত উৎপাদনই হোক, যে সব জিনিস-পত্র উৎপাদিত হয় সেগুলোকে আমরা দু' ভাগে ভাগ ক'রতে পারি। প্রথম বিভাগে পড়ে সে সব জিনিস-পত্র যা আমাদের অভাব পূরণের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করি। এগুলোকে বলা হয় **ব্যবহারিক দ্রব্য**; যেমন ভাত, কাপড়, ঘর, বাড়ী, চেয়ার, টেবিল, ফুটবল, সিনেমা ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে, ঐ সব ব্যবহারিক দ্রব্য তৈয়ার ক'রতে যে

সব জিনিসপত্র দরকার হয় তা, যেমন যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল, জমিজমা, খনি ইত্যাদি। এগুলোর নাম হচ্ছে **উৎপাদন যন্ত্র**। উৎপাদন যন্ত্র তৈরীর বিভাগ এবং ব্যবহারিক দ্রব্য তৈরীর বিভাগ বারে বারে না লিখে এদের জন্য আমরা দুটো সঙ্কেত ব্যবহার ক'রব। উৎপাদন যন্ত্র উৎপাদন বিভাগের জায়গায় লিখব I ( উচ্চারণ—আই )। আর ব্যবহারিক পণ্যের বদলে লিখব II ( উচ্চারণ—পাই ) মনে কর কোন পুঁজিবাদী এক বছরে যত উৎপাদন করাল তাতে তার খরচ পড়ল—

যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল
পুঁজি বাবদ = ৪০০·০০ টাকা

মজুরদের মজুরী বাবদ ( অর্থাৎ পরিবর্তনশীল
পুঁজি বাবদ ) = ৩০০·০০ টাকা

মোট ৭০০·০০ টাকা

মনে কর, এই মোট ৭০০·০০ টাকা খরচ করে ৩০০·০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরী হ'ল ; তার মোট মূল্য হবে—

পরিবর্তনশীল পুঁজি—৩০০·০০ টাকা
অপরিবর্তনশীল পুঁজি—৪০০·০০ টাকা
ও বাড়তি মূল্য—৩০০·০০ টাকা

মোট ১,০০০·০০ টাকা

সমাজে প্রত্যেক বৎসর মোট যত উৎপাদন যন্ত্র তৈরী হয় তার মোট মূল্য হবে—যতখানি কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল পুঁজির মূল্য উৎপাদন যন্ত্রের ভেতর চলে গেছে, ও যতখানি শ্রমশক্তির মূল্য অর্থাৎ মজুরি হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে এবং যতখানি বাড়তি মূল্য তৈরী হ'য়েছে তা একসঙ্গে যোগ করলে যত হবে তার সমান। অতএব কারখানায় মোট যত জিনিস-পত্র তৈরী হবে তার মূল্য হবে ১,০০০'০০ টাকা।

সুতরাং উৎপাদন যন্ত্রের মোট মূল্য হবে=অপরিবর্তনশীল পুঁজি+পরিবর্তনশীল পুঁজি+বাড়তি মূল্য।

তেমনি, ব্যবহারিক পণ্য যত কিছু তৈরী হ'ল তার মূল্যও হবে, সেসব তৈরী করতে মোট অপরিবর্তনশীল পুঁজি কতটা খরচ হ'ল, কতটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে ব্যয়িত হল ও কতখানি বাড়তি মূল্য তৈরী হ'ল, তার উপর।

সুতরাং ব্যবহারিক পণ্যের মোট মূল্য=অপরিবর্তনশীল পুঁজি+পরিবর্তনশীল পুঁজি+বাড়তি মূল্য।

প্রত্যেক বছরে পুঁজিবাদীরা যে বাড়তি মূল্য পায় তার কিছুটা নিজেদের ও পরিবারবর্গের খোরপোষ এবং বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে। এই অংশটা বাদ দিয়ে তারা নানা রকম ব্যবহারিক দ্রব্য কেনে। বাকী যেটা থাকে সেটা তারা আবার ব্যবসায়ে খাটায় নূতন পুঁজি হিসাবে। এই নূতন পুঁজি আবার দু'রকম ভাবে ব্যবহার করে; একটা অংশ দিয়ে

কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল পুঁজি কেনে, আর একটা অংশ পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে মজুরদের শ্রমশক্তি কিনতে খরচ করে।

I বিভাগে যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এই যন্ত্রপাতি কেনে কারা? কিছুটা কেনে I বিভাগের পুঁজিবাদীরাই। তাদের কিছুটা কিনতে হয় নিজেদের কারখানার কলকব্জা যে সব ক্ষয় হ'য়ে গেল তা পূরণ ক'রবার জন্য এবং নূতন যেটা পুঁজি তারা ব্যবসায় খাটাতে চাচ্ছে তার জন্য অপরিবর্তনশীল অংশটা দিয়েও কিছু যন্ত্রপাতি কেনে। এইরূপে I বিভাগের মধ্যেই পুরাতন যন্ত্রপাতির ক্ষয় পূরণ করবার জন্য এবং নূতন যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য I বিভাগের তৈরী যন্ত্রপাতি কিছুটা বিক্রি হয়ে যায়। বাকী যেটা থাকে সেটা তাদের II বিভাগের পুঁজিবাদীর কাছে বিক্রি করতে হবে। নতুবা এই সব যন্ত্রপাতি আর বিক্রি হবে না। II বিভাগ তৈরী করে ভাত, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য। এদের জিনিস কেনে কারা? কিছুটা II বিভাগের লোকেরাই কেনে। বাকীটা তাদের বিক্রি করতে হয় I বিভাগের কাছে।

এখানে I বিভাগ যত মূল্যের যন্ত্রপাতি II বিভাগের কাছে বিক্রি করতে চাচ্ছে II বিভাগ যদি ঠিক তত মূল্যের খাবার-দাবার, ধুতি-শাড়ী ইত্যাদি I বিভাগের কাছে বিক্রি করতে চায়, তা হলেই দু'বিভাগেরই সব জিনিস-পত্র বিক্রি হয়ে যাবে। নতুবা এক বিভাগ যদি অন্য বিভাগের চাইতে বেশী মূল্যের জিনিস

তৈরী করে ফেলে, তাহলেই আর তাদের সমস্ত জিনিস বিক্রি হবে না, কিছু জিনিস অবিক্রীত থেকে যাবে। ফলে এই বিভাগের পুঁজিবাদীদের লোকসান হবে। তখন পুঁজিবাদীরা উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে মজুর ছাটাই করে দেবে এবং কারখানা বন্ধ করে দেবে। মজুর ছাটাই করে দিলে বা মজুরদের মাইনে কমিয়ে দিলে তারা জিনিস-পত্র কিনতে পারবে না। কারণ চাকরী না থাকলে পকেটে পয়সা থাকে না। আর পকেটে পয়সা না থাকলে জিনিস-পত্র কিনবে কোথেকে? কাজেই বাজারে যেটুকুও বা জিনিস-পত্র আগে বিক্রি হচ্ছিল এখন তা আরও কম বিক্রি হতে থাকবে। মজুররা বেকার হয়ে গেলে II বিভাগের জিনিস-পত্র বিক্রি কমে যাবে। কারণ, মজুররা ভাত-কাপড়, চাল-ডাল ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্যই বেশী কেনে। এমন অবস্থায়ই এই সব জিনিস বাজারে অবিক্রীত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ জিনিসগুলো বিক্রি না হ'লে II বিভাগের পুঁজিবাদীদের লোকসান হতে থাকে। তখন তারা কারখানা বন্ধ করে দেয়। ফলে কলকব্জা বিক্রিও কমে যায় এবং I বিভাগের পুঁজিবাদীদেরও লোকসান হ'তে থাকে। তখন I বিভাগের পুঁজিবাদীরা তাদের কারখানা বন্ধ করে দিতে এবং উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে সেখানকার মজুরেরাও বেকার হ'য়ে পড়ে। তখন তারা II বিভাগের যে সব জিনিস-পত্র কিনত, আর কিনতে পারে না। ফলে II বিভাগের যেটুকুও বা উৎপাদন হচ্ছিল তাও বন্ধ

হয়ে যেতে থাকে এবং আরও বেশী শ্রমিক বেকার হ'য়ে পড়ে। এইরূপে ব্যবসা-সঙ্কট ও বেকার ক্রমেই সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

পুঁজিবাদীর উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা। সুতরাং উৎপাদন যন্ত্র বা ব্যবহারিক দ্রব্য যাই সে উৎপাদন করুক, বাজারে বেচতে হবে। বাজারে বেচতে পারলেই বাড়তি মূল্য যেটা উৎপাদিত হ'ল, তা টাকায় রূপান্তরিত হবে, এবং যত টাকা ব্যবসায় লাগিয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশী টাকার আওয়াজ শুনে মনে মনে সে প্রচুর আনন্দ পাবে।

কিন্তু বাজারে বেচতে গিয়ে পুঁজিবাদীদের মাঝে মাঝে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। সেই মুস্কিলটাই আমরা এবার দেখব।

পূর্বেই বলেছি, I বিভাগে যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। তার কিছুটা I বিভাগেই বিক্রি হ'য়ে যায়। বাকীটা বিক্রি ক'রতে হয় II বিভাগের কাছে। II বিভাগ তৈরী ক'রে ভাত, কাপড়, ইত্যাদি। এগুলোর কিছুটা II বিভাগের লোকেরাই কেনে। বাকীটা তাদের বিক্রি ক'রতে হয় I বিভাগের লোকদের কাছে।

I বিভাগে যত বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণ মনে কর ৩০০'০০ টাকা। এই তিন শ' টাকার ১০০'০০ টাকা পুঁজিবাদী নিজের ও পরিবারের জন্য খরচ করে। ১০০'০০

টাকা নূতন শ্রমশক্তি কেনবার জন্য খরচ করে অর্থাৎ মজুরী দেয় ; এবং বাকী ১০০·০০ টাকার যন্ত্রপাতি কেনে। মনে কর, পুঁজিবাদীর যে পুরাতন যন্ত্রপাতি খরচ হয় তার পরিমাণ ৪০০·০০ টাকা এবং পুরানো শ্রমশক্তির মজুরী হিসেবে ৩০০·০০ টাকা খরচ করে। সুতরাং I বিভাগে, অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্র বিভাগে, যে সব পণ্য তৈরী হয় তার মোট মূল্য হ'ল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| | যন্ত্রপাতি | (C)—৪০০·০০ | টাকা |
| | শ্রমশক্তি | (V)—৩০০·০০ | „ |
| বাড়তি মূল্য | পুঁজিবাদীর খরচ | (a)—১০০·০০ | „ |
| | নূতন শ্রমশক্তি | (bv)—১০০·০০ | „ |
| | নূতন যন্ত্রপাতি | (bc)—১০০·০০ | „ |
| | | মোট—১,০০০·০০ | টাকা |

II বিভাগে অর্থাৎ ব্যবহারিক পণ্য বিভাগেও এইরূপ উৎপাদিত ব্যবহারিক দ্রব্যের মোট মূল্য মনে কর,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | যন্ত্রপাতি | (C)—২০০·০০ | টাকা |
| | শ্রমশক্তি | (V)—২০০·০০ | টাকা |
| বাড়তি মূল্য | পুঁজিবাদীর খরচ | (a)— ৫০·০০ | টাকা |
| | নূতন শ্রমশক্তি | (bv)— ৫০·০০ | „ |
| | নূতন যন্ত্রপাতি | (bc)—১০০·০০ | „ |
| | | মোট—৬০০·০০ | টাকা |

এখন দেখা যাক্ I বিভাগের ১,০০০'০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তারা কাদের কাছে কত বিক্রি করতে পারে এবং II বিভাগের ৬০০'০০ টাকা মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য কোথায় কত বিক্রি হতে পারে। I বিভাগের উৎপাদিত ১,০০০'০০ টাকার পণ্যের ভেতর I বিভাগের ভেতরেই পুরাতন যন্ত্রপাতি পূরণের জন্য ৪০০'০০ টাকা এবং নূতন যন্ত্রপাতির জন্য ১০০'০০ টাকার পণ্য বিক্রি হ'য়ে যেতে পারে। ১,০০০'০০ টাকার ভেতর তা হ'লে ৫০০'০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি I বিভাগের ভেতরেই বিক্রি হ'য়ে যায়। বাকী ৫০০'০০ টাকার যন্ত্রপাতি তাকে II বিভাগের কাছে বিক্রি ক'রতে হয়।

II বিভাগের ৬০০'০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্যের ভেতর II বিভাগের পুঁজিবাদীরাই কেনে ৫০'০০ টাকার; পুরাতন শ্রমিকেরা কেনে ২০০'০০ টাকার এবং নূতন শ্রমিকেরা কেনে ৫০'০০ টাকার দ্রব্য। সুতরাং II বিভাগের উৎপাদিত ৬০০'০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্যের ভেতর II বিভাগের ভেতরেই বিক্রি হ'য়ে যায় ৩০০'০০ টাকার দ্রব্য। বাকী ৩০০'০০ টাকার দ্রব্য তাকে বিক্রি ক'রতে হয় I বিভাগের কাছে।

সুতরাং I বিভাগ যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে চায় ৫০০'০০ টাকার II বিভাগের কাছে। আর II বিভাগ ৩০০'০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি ক'রতে চায় I বিভাগের কাছে। ফলে, II বিভাগের ৩০০'০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি হ'য়ে যায় I বিভাগের কাছে, এবং I বিভাগের ৩০০'০০ টাকার যন্ত্র-

পাতি বিক্রি হ'য়ে যায় II বিভাগের কাছে। সুতরাং II বিভাগের সমস্ত পণ্যই বিক্রি হ'য়ে যায়। কিন্তু I বিভাগের ২০০'০০ টাকার পণ্য অবিক্রীত থেকে যায়। ফলে, I বিভাগের পুঁজিবাদীদের এই ২০০'০০ টাকা লোকসান হয়। উৎপাদিত সব যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে না পারলে তখন তারা উৎপাদন কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ অনেক মজুর ছাটাই করে দেবে, এবং যারা থাকবে তাদের বেতনও কমিয়ে দেবে; ফলে মজুরদের আয় কমে যাবে। আগে তারা ব্যবহারিক দ্রব্য ভাত, কাপড় ইত্যাদি যা কিনছিল, তা আর কিনতে পারবে না। কাজেই II বিভাগেরও অনেক জিনিস অবিক্রীত থেকে যাবে এবং তারা লোকসান দিতে থাকবে। ফলে সেখান থেকেও মজুর ছাটাই ও বেতন কমান হবে এবং যতই এই মজুর ছাটাই ও বেতন কমান চলবে, ততই মজুরদের আয় কমে যাবে ও তারা বাজার থেকে জিনিস-পত্র কিনতে পারবে না। ফলে আরও বেশী পরিমাণ জিনিস-পত্র বাজারে অবিক্রীত হ'য়ে পড়ে থাকবে। কিছুদিনের ভেতর এত বেশী জিনিস-পত্র বাজারে জমা হ'য়ে উঠবে যে বাধ্য হয়ে II বিভাগের পুঁজিবাদীরা কারখানা বন্ধ করে দেবে। ফলে I বিভাগের তৈরী যন্ত্রপাতি তারা আর কিনবে না, এবং I বিভাগেও লোকসান যেতে থাকবে। তখন তারাও কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। এইরূপে একদিকে যেমন অবিক্রীত জিনিস-পত্রে বাজার বোঝাই হয়ে থাকবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে

কেনার ক্ষমতা না থাকায় হাজার হাজার বেকার মজুরদের না খেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে। এদিকে যেমন কারখানা, কলকব্জা, কাঁচামাল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকবে, অন্যদিকে মজুররা কাজের অভাবে না খেতে পেয়ে মরবে। বেকার মজুর আর অচল কারখানা, মজুত খাদ্যদ্রব্য আর ক্ষুধার্ত মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার এই পরিণতিকে বলে ব্যবসা-সঙ্কট। I বিভাগ ও II বিভাগের উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না বলে এইরূপ বিপর্যয় ঘটে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় এইরূপ I ও II বিভাগের উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্য যে আকস্মিক ভাবে হয় তা নয়। বরং সামঞ্জস্য হওয়াটাই বেশী আকস্মিক। কারণ, আমরা আগে দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও মুনাফার জন্য উৎপাদন। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকে বলে পুঁজিবাদীরা যার যেমন খুশী জিনিস-পত্র তৈরী করায়। ফলে I বিভাগে কত পরিমাণ উৎপাদন হবে এবং II বিভাগে কত পরিমাণ উৎপাদন হবে তার কিছুই ঠিক থাকে না। শুধু তাই নয়, কোন্ ব্যবসায় কত পরিমাণ নূতন পুঁজি খাটাবে তাও পুঁজিবাদীর নিজের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। ফলে I বিভাগে কতটা নূতন পুঁজি খাটবে এবং II বিভাগেই বা কতটা খাটবে তার কিছু স্থিরতা থাকে না। I বিভাগে নূতন পুঁজি বেশী

খাটলে I বিভাগের উৎপাদন বেশী হয়ে যায়, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বেশী তৈরী হয়ে যায়; আর II বিভাগে নূতন পুঁজি বেশী খাটলে II বিভাগের উৎপাদন, অর্থাৎ কাপড়চোপড়, জুতো, খাবার ইত্যাদি বেশী তৈরী হয়ে যায়। I বিভাগে উৎপাদন বেশী হলে যন্ত্রপাতি অবিক্রীত হয়ে থাকে এবং ব্যবসা-সংকট এখান থেকে সুরু হয়, আর II বিভাগের উৎপাদন বেশী হলে, কাপড়চোপড় ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য অবিক্রীত পড়ে থাকে এবং এই সব জিনিস-পত্র তৈরীর কারখানা থেকে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হয়। কিন্তু যেখান থেকেই আরম্ভ হউক, একবার আরম্ভ হ'লে দেখতে দেখতে দাবানলের মত দাউ দাউ করে তা সমস্ত কারখানায় কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসা-সঙ্কটের ধাক্কা শুধু যে কলকারখানাগুলোর উপরই পড়ে তা নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, রেল-চলাচল, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি উৎপাদনের যাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যবসা-সঙ্কটের বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। কেনা বেচা কমে যায় বলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে আসে; মাল চলাচল কমে যায় বলে রেল ও জাহাজ কোম্পানী লোকসান দিতে থাকে। ব্যাঙ্কের লাভ হয় পুঁজিবাদীদের টাকা ধার দিয়ে; পুঁজিবাদী ব্যবসা-সঙ্কটের ফলে কারখানা বন্ধ ক'রে দেয়, তাই ব্যাঙ্কের টাকা আর শোধ দিতে পারে না। তখন ব্যাঙ্কও ফেল পড়ে। এইরূপে চারিদিকে একটা সঙ্কট দেখা দেয়।

তা ছাড়া লাভের জন্য উৎপাদন করে বলে, পুঁজিবাদীরা

মজুরদের মজুরী কিছুতেই বেশী দিতে চায় না। কারণ মজুরী যত বেশী দেবে, মুনাফা তত কমে যাবে। কিন্তু মজুরী কম দেওয়ার ফলে মজুররা কাপড়-চোপড়, জুতো-জামা, খাবারদাবার ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে কিনতে পারে না। অপর দিকে মজুরদের মাইনে যত কম দেবে পুঁজিবাদীদের তত বেশী লাভ হবে; এবং যত বেশী তাদের লাভ হবে তত বেশী টাকা তারা নূতন পুঁজি হিসাবে খাটাবে; এবং যত পুঁজি খাটাবে তত উৎপাদন বেড়ে যাবে। এইরূপে একদিকে উৎপাদন ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলবে, অপর দিকে মজুরদের বেতন কম থাকার ফলে, মজুরদের কেনবার ক্ষমতা তেমন বাড়বে না। ফলে ব্যবহারিক দ্রব্য অনেক অবিক্রীত থাকবে এবং এই বিভাগে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হবে। এই বিভাগে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হলে তা কিছুদিনের মধ্যেই যন্ত্রপাতি-উৎপাদন-বিভাগেও ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রেই সঙ্কট দেখা দেবে।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পুঁজিবাদীরা কি উপায় অবলম্বন করে? মুনাফা হয়না বলেই পুঁজিবাদীরা কল কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং কোন রকম ক'রে যদি মুনাফার হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই লাভের আশায় পুঁজিবাদীরা আবার কল কারখানা খুলবে; শ্রমিকেরা আবার কাজ পাবে এবং ব্যবসা-সঙ্কট দূর হবে। কিন্তু মুনাফার হার, আমরা জানি, নির্ভর করে বাড়তি মূল্যের হার এবং কারখানার যান্ত্রিক

সংগঠনের উপর। বাড়তি মূল্যের হার যত বেশী হয় মুনাফার হার তত বেশী হয় এবং যান্ত্রিক সংগঠন যত বেশী হয় মুনাফার হার তত কমে। সুতরাং মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য পুঁজিবাদীরা উৎপাদন সংগঠনের উন্নতি করবে, শ্রমের ঘনত্ব বাড়ে এমন সব উৎপাদন-প্রথা, শ্রম-বিভাগ ও কলকব্জা চালু করবে। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক-সংগঠন কমাবার জন্য যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবে এবং পুঁজি বিদেশে চালান দেবার চেষ্টা করবে এবং বাজার খালি করার জন্য উৎপাদিত পণ্য নষ্ট করে দেবে।

সাধারণতঃ তিন রকম উপায়ে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমতঃ অবিক্রীত জিনিস-পত্র নষ্ট করে দিয়ে—গম পুড়িয়ে দিয়ে, শস্য সমুদ্রের জলে ঢেলে দিয়ে, যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলে। এইরূপে গত ১৯৩০-৩৩ সালের ব্যবসা-সঙ্কটের সময় কত কোটী কোটী মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, কত কোটী মণ কফি আমাজোনা নদীতে ঢালা হয়েছে, কত ফলমূল, কমলালেবু যে আটলান্টিকের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব নেই। অথচ এই সময়েই এক আমেরিকাতেই ১৩০ লাখ মজুর বেকার হয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কী কষ্টে যে অর্ধাহারে, অনাহারে, ভিক্ষা ক'রে দিনপাত করছিল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঐ সব অবিক্রীত জিনিস-পত্র ক্ষুধার্ত মজুর ও তাদের শিশুদের বিনে পয়সায় দিয়ে দিলে বাজার নষ্ট হয়ে যেত।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার দ্বিতীয় উপায় হ'চ্ছে এইসব অবিক্রীত মাল বিদেশের বাজারে, বিশেষ করে কলোনীর বাজারে, বিক্রি করার চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বাজার দখল করার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতর পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিদেশী মাল যাতে দেশে ঢুকে দেশের বাজার দখল করে নিতে না পারে তার জন্য বিদেশী আমদানির উপর উচ্চ হারে মাশুল বা ট্যাক্স বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশই উচ্চ মাশুল বসিয়ে দেওয়ায় এদিক দিয়ে কারও বিশেষ সুবিধে হয় না। শুধু কে কত বেশী মাশুল বসাতে পারে তার একটা 'রেস' চলে।

বিদেশী বাজার দখল করার আর এক উপায় হ'চ্ছে দেশের টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া। ইংরাজীতে একে বলে ( depreciation of currency ). মনে কর, একটা ডলারে যতখানি সোনা আছে তার মূল্য তিন টাকা। ডলারের মূল্য অর্ধেক করে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ ডলারের সোনার পরিমাণ অর্ধেক করে দেওয়া হ'ল। ফলে এক ডলারের মূল্য এখন হবে ১·৫০ টাকা। সুতরাং আগে আমেরিকার যে জিনিসের মূল্য ছিল ১ ডলার অর্থাৎ ৩·০০ টাকা, এখন সেটা ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি হবে ১·৫০ টাকা। ফলে আমেরিকার জিনিস-পত্রের দাম ভারতবর্ষে অর্ধেক হয়ে যাবে এবং সস্তা হয়ে যাবার জন্যে লোকে অন্য দেশের জিনিস না কিনে আমেরিকার জিনিস

কিনবে। কিন্তু আমেরিকার দেখাদেখি সব দেশই এই রকম তাদের দেশের টাকার মূল্য কমিয়ে দেবে। ফলে কারোই কিছু লাভ হবে না।

বিদেশী বাজার দখল করার আর এক উপায়কে বলে ডাম্পিং। বিদেশী বাজার দখল করার জন্য পুঁজিবাদীরা সময় সময় পড়তা অপেক্ষা কম দরে বিদেশের বাজারে জিনিস বিক্রি করার চেষ্টা করে, এবং এইভাবে যে লোকসানটা হয় তা তাদের দেশের ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশী দাম আদায় ক'রে ও মজুরদের কম মজুরী দিয়ে পুষিয়ে নেয়। এইভাবে বিদেশের বাজার দখল হবার পর অবশ্য এরা আবার দাম চড়িয়ে ঘাট্‌তি মুনাফা সুদে আসলে তুলে নেয়। এই রকম ভাবে ব্যবসা-সঙ্কটের ফলে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের পরস্পরের সঙ্গে রেশা-রেশি চলে এবং রেশারেশি শেষে একদিন রক্তারক্তিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তৃতীয় উপায় হ'চ্ছে **রেশনেলাইজেশন** (rationalisation) বা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি। রেশনেলাইজেসনের মানে হচ্ছে কারখানার সংগঠনের উন্নতি করে উৎপাদনের পড়তা কমিয়ে ফেলা। এতে এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা হয় যাতে করে শ্রমিকের পরিশ্রমের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং অল্প সময় খাটিয়ে তাদের কাছ থেকে খুব বেশী কাজ আদায় করে নেয়া যায়। তারপর শ্রম-বিভাগও এমন ভাবে করা হয় যাতে শ্রমিকের

এক সেকেণ্ডও ফাঁকি দেবার অবসর না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ **কনভেয়ার সিস্‌টেমের** কথা বলা যায়। এই প্রথা অনুযায়ী মোটর গাড়ীর কারখানার ছাতের কাছে মোটর ইঞ্জিনের কাঠামোটা একটা বেল্টের সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ঝুলন্ত কাঠামোটা তারপর ধীরে ধীরে কারখানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঘুরে আসে। নীচের শ্রমিকেরা লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেকের এক একটা কাজ ভাগ করা থাকে। যেমন কেউ হয়ত একটা স্ক্রু বসিয়ে দেয়, তার পরের শ্রমিক সেই স্ক্রুটাকে শক্ত করে এঁটে দেয়, ইত্যাদি। মোটর গাড়ীর কাঠামোটা যেমন যেমন চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের এই অল্প সময়ের ভেতর তার নিজের কাজ শেষ করে দিতে হয়। যদি কোন মজুর নিজের কাজ না করে, কিংবা একটু ঢিলে দেয়, তাহলে সমস্ত কারখানায় কাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাই সে কিছুতেই কাজে ঢিলে দিতে পারে না। মোটর গাড়ীর কাঠামোটা যত শীঘ্র চলে মজুরকেও তত শীঘ্র হাত চালিয়ে কাজ শেষ ক'রে দিতে হয়। এইরূপে মজুরের শরীর থেকে সমস্ত শ্রমশক্তিটুকু নিঃশেষে আদায় ক'রে নিয়ে তবে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতির অন্য উপায় হচ্ছে পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর ক'রে নিয়ে সব কোম্পানীগুলো মিলে একটা বড় কোম্পানী ক'রে **একচেটিয়া ব্যবসা** স্থাপন করা। এই রকম একচেটিয়া কোম্পানী স্থাপন করতে পারলে তার সবচেয়ে বড়

সুবিধা হয় এই যে, মজুরদের খুব ভাল করে শোষণ করা যায়। মজুরদের এক জায়গা থেকে চাকরী গেলে অন্য জায়গায় গিয়ে যে চাকরী নেবে সে সুবিধে আর থাকে না। কাজেই পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই তাদের পুঁজিবাদীদের সর্তে কাজ করতে হয়। একচেটিয়া ব্যবসার দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে, ক্রেতাদের কাছ থেকে জিনিস-পত্র বিক্রি ক'রে বেশী দাম আদায় করা যায়। এইরূপে অপরের উৎপাদিত মূল্য একচেটিয়া পুঁজিবাদী আত্মসাৎ করতে পারে। তৃতীয় সুবিধা হচ্ছে এই যে, সব পুঁজিবাদী একসঙ্গে হ'য়ে গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে বিদেশী জিনিসের উপর শুল্ক ও অন্যান্য নানারকম সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। মজুরদের উন্নতিমূলক সমস্ত আন্দোলনের বিরোধিতাও তারা ভাল ভাবে করতে পারে। এই সকল কারণে পুঁজিবাদীরা একজোট হ'য়ে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করে।

এইরূপে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক দ্রব্য নষ্ট ক'রে দিয়ে ও মজুরদের কঠোরভাবে শোষণ করে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করে। যথেষ্ট পরিমাণে জিনিস-পত্র নষ্ট করে দেবার পর বাজার কিছুটা খালি হয়। বিদেশী জিনিসের উপর মাশুল বসিয়ে দেওয়ায় দেশের বাজার থেকে বিদেশী জিনিস-পত্র বিতাড়িত হয় এবং "উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতি" করে ও মজুরদের উপর শোষণ বাড়িয়ে দিয়ে জিনিস-পত্র উৎপাদনের পড়তা কমিয়ে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে টাকার মূল্য কমিয়ে ও ডাম্পিং করে বিদেশী বাজারও

কিছুটা দখলে আনা হয়। ফলে কারখানার চাকা আবার আস্তে আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করে; মজুরেরা কিছু কিছু কাজ পেতে থাকে এবং যতই তারা কাজ পায় ততই তাদের জিনিস-পত্র কেনবার ক্ষমতা বাড়ে এবং বাজারে জিনিস-পত্রের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে। জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে এবং মজুরেরা আরও বেশী কাজ পেতে থাকে ও চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায়। এইরূপে ব্যবসা-সঙ্কট দূর হ'য়ে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে খুব কেনা-বেচা হয়, উৎপানও খুব বেড়ে যায়, এবং পুঁজিবাদীদের মুনাফাও বেড়ে যায়। ব্যবসা-সঙ্কট দূর হয়ে গিয়ে উৎপাদন, কেনা-বেচা ও মুনাফার এত দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় **ব্যবসা স্ফীতি** ( boom ), কিন্তু এই ব্যবসা স্ফীতি বেশী দিন চলতে পারে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার সমস্ত অসামঞ্জস্য-গুলো এসে দেখা দিতে থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে এগুলোও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অবশেষে হঠাৎ এমন একটা সময় আসে যখন ব্যবসা-স্ফীতি থেমে যায়; আবার ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হয়। এইরূপে ব্যবসা-স্ফীতি ও ব্যবসা-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে পুঁজিবাদী প্রথা তার ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রত্যেক বার ব্যবসা-সঙ্কট হ'লে ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার উপায়গুলো ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। কারণ, ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার যে সব উপায় আছে, যেমন বিদেশী বাজার দখল, মজুরদের শোষণ বাড়িয়ে দেওয়া, উৎপাদনের সাংগঠনিক

উন্নতি, একচেটিয়া কোম্পানী করা, টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া, এরকম সবগুলো উপায়েরই একটা সীমা আছে। যেমন, একবার একচেটিয়া কোম্পানী গঠন ক'রে ফেললে নূতন ক'রে একচেটিয়া কোম্পানী করবার সুবিধা আর পাওয়া যায় না। বিদেশী বাজার দখল ক'রে ফেললে আবার নূতন ক'রে যুদ্ধ ছাড়া বিদেশী বাজার দখল করা যায় না। এই সকল কারণেই ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার উপায়গুলো ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। অপর দিকে উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতি ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও খুব বাড়ে এবং অবিক্রীত জিনিস-পত্রের পরিমাণও বেড়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক বারের ব্যবসা-সঙ্কট আগের ব্যবসা-সঙ্কটের চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে, ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার উপায় প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে বললেই চলে। ১৯৩০ সাল থেকে যে ব্যবসা-সঙ্কট সুরু হয়েছিল তা থেকে এখনও পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা উদ্ধার পেয়েছে বলা চলে না। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল, বেকারের সংখ্যা কিছুটা কমেছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উৎপাদন ১৯৩০ সালের সমান স্তরে পৌঁছোতে পারে নি, তার ভেতরেই আবার আরম্ভ হ'য়ে গেল ব্যবসা-সঙ্কট। ১৯৩৯ সালে উৎপাদন কমে যেতে লাগল, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ফলে

উদ্ধারের আর কোন উপায় না পেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছিল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, যুদ্ধের অন্যান্য কারণের ভেতর ব্যবসা-সঙ্কটও একটা।

## [ পনেরো ]

## সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন

আমরা এগারোর অধ্যায়ে দেখেছি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। প্রত্যেক কারখানা বা কারবার থেকে যে মুনাফা ওঠে তার একটা মোটা অংশ আবার কারখানায় বা কারবারে খাটাতে হয়, নতুবা প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুঁজিবাদীদের কাছে তাকে হেরে যেতে হয়। এইরূপে প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিবাদী কারবারের আকার ক্রমেই বর্ধিত হয়ে যেতে থাকে। ছোট কারখানা বড় কারখানা হয়ে পড়ে, যেখানে ১০০ মজুর কাজ করত সেখানে দেখতে দেখতে ১০০০ মজুর কাজ করতে থাকে। পুঁজি যেখানে ১,০০০.০০ টাকা ছিল সেখানে ১০,০০০.০০ টাকা হ'য়ে যায়। এই রকম ভাবে বেড়ে-ফেঁপে-ফুলে ওঠাটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রীতি।

ছোট ছোট কোম্পানীগুলো বড় বড় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশী দিন টিকতে পারে না। বড় কোম্পানীগুলো নানান রকম উপায়ে তাদের গ্রাস করে ফেলে। বড় কোম্পানীগুলোর পুঁজি বেশী ব'লে পড়তার চাইতে কম দামে লোকসান দিয়ে জিনিস-পত্র বিক্রি করে। এতে ছোট পুঁজিওয়ালা প্রতিদ্বন্দ্বীরা বড় পুঁজিবাদীর কাছে হেরে যায়, এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় পুঁজিপতির অধিকার তাতে একচেটিয়া হয়। তারপর অবশ্য মনের সুখে দাম চড়িয়ে বড়রা মোটা লাভ ঘরে তুলতে থাকে। কখনও কখনও টাকার জোরে গভর্ণমেণ্ট হাত ক'রে আইন ক'রে ছোট কোম্পানীগুলোকে বড় কোম্পানীর ভেতর চলে আসতে বাধ্য করে। কখনও কখনও আবার তারা যাতে কাঁচামাল না পায়, তার জন্য কাঁচামাল বিক্রি করে যে সব কোম্পানী, তাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে বন্দোবস্ত করে নেয়। কখনও কখনও রেল কোম্পানীর সঙ্গেও বন্দোবস্ত ক'রে যাতে রেল কোম্পানী তাদের মাল চলাচলের কোন ব্যবস্থা না করে। এমন কি গুণ্ডা লাগিয়ে ছোট কোম্পানীর কারখানা বা গুদামে আগুন লাগিয়ে, বা বোমা ফাটিয়ে ছোট কোম্পানীকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। এই রকম সৎ অসৎ সব রকম উপায়ে পুঁজিবাদীরা একচেটিয়া কারবার স্থাপন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। কারণ একচেটিয়া কারবার স্থাপন ক'রলে একদিকে যেমন মজুরদের

খুব নিংড়ে শোষণ করা যায় অপরদিকে ক্রেতাদের কাছ থেকেও বেশ ইচ্ছামত মোটা দাম আদায় করা যায় ও গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে বিদেশের বাজার দখলের সব বন্দোবস্ত করা যায়। এই সকল কারণে এই যুগের পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে **একচেটিয়া কারবার**।

১৮৯০ সাল অবধি সর্বত্র প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের প্রাধান্য দেখা যায়। তারপর থেকে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে। আজ এই একচেটিয়া কারবারই পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার প্রধান রূপ হ'য়ে পড়েছে। এ যুগে যত উৎপাদন হয় তার অধিকাংশই হয় একচেটিয়া কোম্পানীগুলো দিয়ে। যেমন ধর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লোহার মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগই হয় ৪টা বড় বড় কোম্পানীর দ্বারা। এলুমিনিয়াম উৎপাদন শতকরা ৯৫-১০০ ভাগই একটা প্রকাণ্ড কোম্পানী ক'রে থাকে। রেডিও তৈরীও শুধু একটা মাত্র কোম্পানীরই হাতে। এমনি ধারা প্রায় অধিকাংশ জিনিস-পত্রের উৎপাদন প্রধানতঃ বড় বড় কয়েকটা কোম্পানীর হাতে সীমাবদ্ধ। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নয়, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ গুলোতে সব জিনিস-পত্রের উৎপাদনই এইরূপে গোটা কয়েক বড় বড় কোম্পানীর হাতে গিয়ে পড়েছে।

জার্মানীতে Verenigte Stalwerke নামে একটা মস্ত

বড় একচেটিয়া কোম্পানী ১৯২৬ সালে গঠিত হয়েছিল। এর হাতে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোহা ও ৪০ ভাগ ইস্পাতের উৎপাদন ছিল। U. S. Steel Corporation-এর হাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোহা উৎপাদনের মোট শতকরা ৪৩ ভাগ ও ইস্পাত উৎপাদনের ৩৯ ভাগ ছিল। ১৯১৬ সালে জার্মানীতে সোডা, এসিড ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো একত্রিত হয়ে I. G. Farbenindustrie নামে একটা কোম্পানী ক'রে সবাই তাতে যোগ দেয়। এই কোম্পানীর হাতে জার্মানীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ বাতাস থেকে তৈরী নাইট্রিক এসিড, ১০০ ভাগ কয়লা থেকে উৎপাদিত পেট্রোল ও রঙ, ৪০ ভাগ ঔষধ-পত্র, ২৫ ভাগ কৃত্রিম সিল্ক ইত্যাদি ছিল। গ্রেট-ব্রিটেনের Imperial Chemical Industries-এর নাম পৃথিবীর সকলেই জানে। এই কোম্পানী ১৯২৬ সালে অনেকগুলো কোম্পানী এক হ'য়ে গিয়ে তৈরী হয়। এই কোম্পানী বিলাতের শতকরা ৯১ ভাগ এসিড, সোডা ইত্যাদি মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য, ৯৫ থেকে ১০০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৪০ ভাগ রঙ ইত্যাদি তৈরী করে। জাপানেও মিৎসুই, মিৎসুবিশী, সুমিটোমো, য্যাসুডা ইত্যাদি কয়েকটা ধনী পরিবারের হাতে অধিকাংশ উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, ১৯৩০ সালে ২৫৩ লক্ষ টন কয়লার ভেতর ২৪২ লক্ষ টন কয়লাই 'সেকিটান কোগাইয়ো রেন্‌গোকাই' নামে মিৎসুই

ও মিৎসুবিশীদের দ্বারা পরিচালিত একটা কোম্পানী উৎপাদন ক'রেছিল। এইরূপে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকাল এইরূপ বড় বড় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার দেখতে পাওয়া যায়।

শুধু যে কারখানা-শিল্পে এইরূপ একচেটিয়া উৎপাদন এসে গেছে তা নয়, ব্যাঙ্কের ভেতরও এই রকম দু'চারটে ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলো প্রতিযোগিতায় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে না পেরে হয় পাততাড়ি গুটিয়েছে, নয় বড় ব্যাঙ্কের শাখা হয়ে গেছে। এইরূপে বিলাতে ১৯০০ সালে মোট ব্যাঙ্ক ছিল ৯৮টা, ১৯৩৬ সালে এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৬ টাতে। তার ভেতর পাঁচটা ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি আবার এত বেশী হয়ে গেছে যে এদের লোকে "The big five" বলে এবং লেনদেনের ব্যাপারে এদের রাজত্ব অপ্রতিহত। তেমনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯১৪ সালে ছিল ২৬,২৭৪ টা ব্যাঙ্ক, এই সংখ্যা ১৯৩৬ সালে দাঁড়ায় ১৫,৭৫২ টাতে। জাপানে ১৯১৪ সালে ছিল ১,১৫৫টা ব্যাঙ্ক, ১৯৩৬ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৩-টাতে। এই রকম ক'রে বড় ব্যাঙ্কগুলো ছোট ব্যাঙ্কগুলোকে গিলে ফেলেছে এবং নিজেরা এক একটা দৈত্যের আকার লাভ ক'রেছে।

ব্যাঙ্ক, কারখানা ও ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলো এইরূপ প্রকাণ্ড দৈত্যের আকার ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে

পরস্পরের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণতি হয় এই যে, দৈত্যগুলো পরস্পরে সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে বৃহত্তর দৈত্যের সৃষ্টি করে।

শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের যারা কর্তা তারা ধীরে ধীরে কারখানা ও অন্যান্য কোম্পানীগুলোর উপর তাদের অধিকার বিস্তার করে ফেলে। কারণ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এইসব কারখানা ও ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলোকে টাকা ধার ক'রে কারবার চালাতে হয়। ফলে তারা ব্যাঙ্কের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, এবং ব্যাঙ্ক এই সুযোগে কোম্পানীর পরিচালকদের ভেতর নিজেদের আসন করে নেয় এবং অনেক সময় কোম্পানীর শেয়ার কিনে কোম্পানীকে হাতের মুঠোর ভেতর এনে ফেলে। এইরূপে সমস্ত উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের মালিকদের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়।

কখনও কখনও আবার বড় বড় একচেটিয়া কোম্পানীর মালিকেরা ব্যাঙ্কের উপর অধিকার বিস্তার ক'রে ফেলে। অনেক সময় এরা নিজেরাই তাদের পুঁজি বাড়াবার জন্য ব্যাঙ্ক খুলে দেয়। কখনও কখনও এদের লাভের একটা মোটা অংশ দিয়ে ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনে ফেলে। এর ফলে ব্যাঙ্কের উপর তাদের প্রতিপত্তি এসে যায়।

এ ভাবে সমাজে এক রকম মালিক-শ্রেণী জন্মায় যাদের উৎপাদনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু এ ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনে, ও ব্যাঙ্কের শেয়ার বেচে, এ-ও কোম্পানীর

শেয়ার নিয়ে কেনা-বেচা ক'রে ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাদন-কেন্দ্রের উপরই নিজেদের প্রভাব বিস্তার ক'রে ফেলে। এই শ্রেণীর পুঁজিবাদীরা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে থাকে এবং আড়ালে থেকে টাকার খেলা খেলে প্রচুর লাভ করে। সমস্ত বড় বড় কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী ইত্যাদির পরিচালকের পদগুলো এদের একচেটিয়া থাকে। এই রকম ভাবে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্য অল্প কয়েকজন লোকের হাতে এসে পড়ে। যেমন আমেরিকার "মারগান" ব্যাঙ্ক ১৯২৮ সালে মোট ৭,৪০০ কোটি ডলার মূল্যের বিভিন্ন ব্যবসা চালায়, তখন ৭২টা বড় বড় কোম্পানী তাদের হাতে ছিল। ১৯২৯ সালে ২৪ জন বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিক ৪৩৮টা কারবারের পরিচালক ছিল। একজন ব্যাঙ্কারের হাতেই ছিল ৪৭টা কারবার। একটা হিসাবে প্রকাশ, ১৫ জন লোক ২,১১৭টা কোম্পানীর ডিরেক্টার ছিল।

এই সকল তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজের ধনসম্পত্তি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে। নাৎসী জার্মানীতে ১০০ থেকে ১৪০ জন মাত্র লোক জার্মানীর সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রের আসল ঘাঁটিগুলো দখল ক'রে ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বার্লিনস্থ দূত গেরার্ড বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৬৪ জন লোক সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ধন-সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত করে। ফ্রান্সের অধিকাংশ উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক ২০০ পরিবারের কথা সকলের কাছে সুপরিচিত।

এই ২০০ পরিবারের ভেতর আবার ১০০ জন লোক সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এইরূপে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা কয়েকজন লোককে অসাধারণ ধনী করিয়ে দিয়ে তাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বেসর্বা করে তোলে।

এমনি একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করার পর যে প্রচুর লাভ হতে থাকে, তা দেশের বাজারে খাটাবার সুযোগ থাকে না। কারণ দেশের বাজার অবিক্রীত পণ্যে বোঝাই হয়ে যাবার পরই এই একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সুতরাং যে নূতন পুঁজি সৃষ্টি হয় সেটা বিদেশের বাজারে খাটাবার চেষ্টা চলতে থাকে। যে সব দেশে পুঁজিবাদ তেমন জেঁকে বসে নি, সেই অনুন্নত দেশে পুঁজি পাঠিয়ে সেখানকার কাঁচামাল থেকে পণ্য তৈরী ক'রে বিক্রি করলে লাভ অনেক বেশী হয়। কারণ ঐ সব দেশে কাঁচা মাল ও মজুরদের খুব সস্তায় পাওয়া যায়; আর মজুর আন্দোলন এই সব অনুন্নত দেশে তেমন শক্তিশালী থাকে না বলে মজুরদের শোষণ করাও যায় খুব আরামে ও শান্তিতে। ফলে, ঐ সব অনুন্নত উপনিবেশ বা কলোনীতে পুঁজি রপ্তানি হতে থাকে। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে রপ্তানি হয় পণ্য, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে পণ্য রপ্তানি কমে যায় এবং পুঁজি রপ্তানিই প্রধান হ'য়ে পড়ে। কারণ পুঁজি রপ্তানি ক'রে বেশ ভাল সুদ পাওয়া যায় আর মুনাফাও ওঠে অনেক বেশী। কলোনীতে এই পুঁজি রপ্তানি করে তাদের উপকার করার ঝক্কি

অবশ্য ব্যাঙ্কগুলোই গ্রহণ ক'রে থাকে। এ ব্যাপারেতেও অবশ্য নেতৃত্ব করে পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেষ্ঠ মানব ধন-কুবেররা। গ্রেট ব্রিটেনের ১৯২৯ সালে এ রকম বিদেশী পুঁজির থেকে আয় হয়েছিল ১২২ কোটী ডলার; যুক্তরাষ্ট্রের হয়েছিল ৮৮ কোটী ডলার, ফ্রান্সের ১৮ কোটী ডলার, এবং জাপানের হয়েছিল ৪½ কোটী ডলার। গত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে অবশ্য একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। গ্রেট ব্রিটেনের অধিকাংশ বিদেশী পুঁজি আমেরিকার কাছে বিক্রি হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের পরে বিদেশের কাছে ধার দেওয়া টাকা আমেরিকারই সব চেয়ে বেশী হ'ল। ভারতবর্ষ পূর্বে বিলেতের কাছে টাকা ধারত এবং ১৯২৯ সালে বিদেশী পুঁজির স্থদ ও লাভ বাবদ মোট ১৩ কোটী ডলাব তাকে দিতে হয়েছিল। যুদ্ধের জন্য বিলেতের কাছে ভারতবর্ষ এত বেশী জিনিস-পত্র বিক্রি করেছে যে তার কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত দেনা শোধ হয়েও প্রায় ১,০০০ কোটী টাকা তখন পাওনা হয়েছিল।

পুঁজিবাদী দেশের ধন-কুবেররা যে শুধু নিজের দেশে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন ক'রে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেলে তা নয়, অন্যান্য দেশের ধন-কুবেরদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীটাকে নিজেদের ভেতর ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেবার চেষ্টা করে। এইরূপে ১৯২৯ সালে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ-সরবরাহ কোম্পানী Allegem Elektrik Gesellschaft-এর সঙ্গে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ

সরবরাহ কোম্পানী General Electric Company-র ২০ বছরের জন্য একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর হাতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের, মধ্য আমেরিকার এবং ক্যানাডার বাজার, আর জার্মান কোম্পানীর হাতে থাকে মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের বাজার। এইরূপ আর একটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবার ছিল 'গ্লু ল্যাম্প কারটেল'। জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট-ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, ইটালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত বাল্‌ব তৈরীর কারখানাগুলো এই একচেটিয়া কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিল।

পেট্রোলের ব্যাপারে কয়েকটা বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানী পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে। পৃথিবীর তেলের বাজার প্রধানতঃ স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, রয়েল ডাচ্ শেল এবং এ্যাঙ্গলো পার্শিয়ান ও বার্মা অয়েল কোম্পানী এই তিনটার মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকা, ম্যাক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় সাধারণতঃ আমেরিকার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর একচেটিয়া প্রতিপত্তি। সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশে রয়েল ডাচ্ শেল ও এ্যাঙ্গলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী-গুলিরই প্রতিপত্তি বেশী ছিল। কিন্তু এখানে আমেরিকার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী অনেক শেয়ার কিনে ফেলে তাদের

কিছুটা হাত ক'রে ফেলেছে। পারস্য দেশে ও ইরাকে এই তেলের সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই সব আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলি পৃথিবীর বাজারটাকে নিজেদের ভেতর ভাগ করে নেবার চুক্তি করলেও তাদের ভেতর প্রতিযোগিতা থামে না এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে তাদের চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হয়। কারণ কোন দেশেরই উৎপাদন-প্রথার উন্নতি পৃথিবীর আর সমস্ত দেশের সঙ্গে সমান তালে চলে না। কোন কোন দেশে নানা কারণে হঠাৎ কিছু দিন দ্রুত উন্নতি হয়। আবার কোন কোন দেশ একেবারে পেছিয়ে পড়ে। কোন দেশ হয়ত নূতন কোন উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার ক'রে ফেলল, কোন নূতন যন্ত্রপাতি তৈরী করে ফেলল; তার ফলে তাদের পড়তা হয়ত খুব কম হয়ে যাবে, তখন তারা দেখবে যে তারা অনায়াসেই তাদের বাজার আরও বাড়িয়ে ফেলতে পারছে। তখন আর কোন চুক্তির ধার না ধেরে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর বাজারে তাদের মাল হাজির করবে। এইরূপ অসমান উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের ভেতর কোন চুক্তি বেশী দিন টেকে না এবং তাই কিছু দিনের ভেতরেই ভীষণ রকম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। এই সমস্ত একচেটিয়া ধন-কুবেরদের যে শুধু তাদের দেশের সমস্ত উৎপাদন-প্রণালীর ও ধনসম্পত্তির উপর প্রতিপত্তি

থাকে তা নয়, দেশের গভর্ণমেণ্টও তাদের হাতে থাকে। গভর্ণমেণ্টে কে কোন পদের অধিকারী হবে তা তারা ঠিক করে দেয় এবং গভর্ণমেণ্টকে তাদের মত অনুযায়ী চলতে হয়। এই ধন-কুবেরদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা তারা পুরোপুরি কাজে লাগায়; এবং যখন অন্যান্য দেশের ধন-কুবেরদের সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সব রকম চেষ্টা করে। এইরূপে যুদ্ধের আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর বাজার আবার বিভিন্ন একচেটিয়া ধন-কুবেরেরা নিজেদের ভেতর ভাগাভাগি করে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে শুধু যে যুদ্ধের ফলে কোটি কোটি মানুষ মারা পড়ে ও মানুষের দুঃখভোগ চরমে ওঠে তা নয়। শান্তির সময়েও সাধারণ লোকদের জীবন দারুণ অশান্তিতে ভরে যায়। ব্যবসা-সঙ্কট এসে স্থায়ী আকার ধারণ করে, ফলে হাজার হাজার শ্রমিক স্থায়ীভাবে বেকার থেকে যায়। যারা কাজ পায় তাদের চাকুরীরও কোন স্থায়িত্ব থাকে না। এতে জীবনে অনিশ্চয়তা ও ব্যর্থতাবোধ কোটী কোটী লোকের জীবন বিষাক্ত ও দুর্বিসহ করে তোলে। এর ফলে দেখতে পাই এই যুগে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে।

আত্মহত্যার সংখ্যা

| | যুক্তরাষ্ট্র | ব্রিটেন | জার্মানী |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | ৯,৯৮৮ | ৩,৭৯১ | ১৫,৫৬৪ |

| | যুক্তরাষ্ট্র | ব্রিটেন | জার্মানী |
|---|---|---|---|
| ১৯২৯ | ১৬,২৬০ | ৫,৫২৯ | ১৫,৬৬৫ |
| ১৯৩২ | ১৯,৯২৩ | ৬,১৪৮ | ১৮,৮০১ |

একচেটিয়া ধন-কুবেরেরা কি ভাবে মজুরদের শেষ শ্রম-শক্তিটুকুও শোষণ ক'রে আনে তা বোঝা যাবে দু'একটা উদাহরণ দিলে। আমেরিকার একটা কারখানার ৩,০০০ মজুরদের মধ্যে যত অসুস্থ ও আহত হয়েছিল তাদের ভেতর স্নায়বিক অবসাদ-গ্রস্তের শতকরা হিসাব এই রকম :—

| | ১৯২৬ | ১৯২৭ | ১৯২৮ | ১৯২৯ |
|---|---|---|---|---|
| (শতকরা) | ১২ জন | ১৮ জন | ২৯ জন | ৩৪ জন |

আর একটা কারখানায় ১,২০০ মেয়ে-মজুর নিযুক্ত করা হয়। কাজে ভর্তি হবার সময় ৩১২ জনের চোখে চশমা ছিল; এক বছর কাজ করার পর ৭৩১ জনের চশমা নিতে হয়।

কোন একটা ফ্যাক্টরীর মজুরদের ভেতর অসুস্থতার সংখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল—

| বৎসর | আকস্মিক দুর্ঘটনা | স্নায়বিক অবসাদ | মানসিক পীড়া |
|---|---|---|---|
| ১৯২৬ | ২,৫৩৫ | ৬৯৬ | ৩৯ |
| ১৯২৭ | ২,৫৫৩ | ৭৬৮ | ৩৫ |
| ১৯২৮ | ২,৬৯৩ | ৮৭০ | ৪০ |
| ১৯২৯ | ২,৯৩১ | — | ৫৫ |

এইরূপে কোটী কোটী লোককে যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে হত্যা ক'রে, কোটী কোটী লোকের জীবন বেকারত্বের গ্লানিতে ব্যর্থ করে দিয়ে,

কোটী কোটী লোককে শোষণ-যন্ত্রে ফেলে পঙ্গু ক'রে দিয়ে বর্তমান যুগের ধন-কুবেররা তাদের ধন-ভাণ্ডারে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে।

অবশ্য শুধু এই নয় যে, উৎপাদন-যন্ত্র তাদের হাতে পড়ে শোষণ-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, এর চেয়েও সমস্যার কথা হ'ল উৎপাদন-যন্ত্রকে তারা পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগায় না, পাছে উৎপাদন আরও বেড়ে গিয়ে ব্যবসা-সঙ্কট তীব্র করে তোলে। এইরূপে জার্মানীতে ১৯২৯ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র শতকরা ৬৭ ভাগ ব্যবহৃত হ'ত। ১৯৩২ সালে মাত্র ৩৬ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহৃত হ'চ্ছিল। আমেরিকায় শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে। অথচ যখন পৃথিবীতে কোটী কোটী মানুষ খাওয়া-পরা ও থাকার অভাবে তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন এই উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব মোচন করা ও খাওয়া-পরার অভাব দূর করা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, তখন এই ধন-কুবেররা তাদের একচেটিয়া ক্ষমতার বলে উৎপাদন বেশী হতে দেয় না—পাছে তাদের লাভ কমে যায় এই ভয়ে। সুতরাং এদের কাজ হচ্ছে অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা উঠান, অভাব পূরণ করা নয়।

এইরূপে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগে দেশের ভেতর কয়েকটা বড় বড় ধন-কুবেরের সৃষ্টি হয়। এদের হাতে দেশের সমস্ত উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক এসে পড়ে

এবং এরা দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন করে। শুধু যে দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপন ক'রেই এরা ক্ষান্ত হয় তা নয়, অন্যান্য দেশের একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবার স্থাপন ক'রে থাকে এবং সাময়িকভাবে পৃথিবীটাকে নিজেদের ভেতর ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। কিন্তু ব্যবসা-সঙ্কটের ধাক্কায় ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার উন্নতি হওয়াতে এই গোঁজামিল বেশী দিন টেকে না, বিশ্বের বাজার পুনর্বার ভাগ বাটোয়ারা করার দাবী ওঠে। ফলে যুদ্ধ বাধে এবং যারা যুদ্ধে জিতে যায় তারা পৃথিবীর বাজার দখল করে বসে। পৃথিবীর বাজার দখল ক'রে এরা অনুন্নত দেশগুলোতে এদের পুঁজি পাঠাতে থাকে এবং সেখানকার লোকেদের শোষণ ক'রে মোটা রকমের মুনাফা ও সুদ ভোগ করতে থাকে। ফলে কিছুদিনের ভেতর এই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পুঁজিবাদীরা আসল উৎপাদনের দিকে আর বেশী মনোযোগ না দিয়ে কি ক'রে কলোনীর কাছ থেকে সুদ ও মুনাফা উঠাবে সেই দিকে নজর দেয় এবং দেখতে দেখতে এই সব দেশগুলোর বুর্জোয়ারা সুদখোরের জাতে পরিণত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের মূল সমস্যা অর্থাৎ ব্যবসা-সঙ্কট, বেকার, যুদ্ধ ইত্যাদি কোন সমস্যারই সমাধান করতে তো পারেই না বরং এই সব সমস্যাগুলোকে আরও ঘোরতর আকারে বাড়িয়ে দেয়। ফলে নিজেদের দেশের মজুরদের আক্রমণে,

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর আক্রমণে ও তাদের অধীনস্থ কলোনীর লোকদের আক্রমণে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে এবং তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই হল পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদের একমাত্র পরিণতি।

## [ ষোল ]

## পরিশিষ্ট

তোমাদের ভেতর অনেকে হয়ত বীজগণিত দেখলে ভূতের ভয় পাও। কিন্তু অনেকের পক্ষে বীজগণিতের ভাষায় জিনিস বোঝাও সুবিধা, চিন্তা করাও সহজ। তাদের জন্য আমাদের মোটামুটি সিদ্ধান্ত ও তার প্রমাণগুলো বীজগণিতের ভাষায় দিচ্ছি—

১। বাড়তি মূল্য—

মনে কর, $M =$ পুঁজি

$C =$ পণ্য

$M' =$ বর্ধিত পুঁজি

$S =$ বাড়তি মূল্য

তাহলে, আগের যুগের বিনিময়কে ( যখন বিনিময় লাভের

জন্য হত না, এক পণ্য দিয়ে অন্য পণ্য পাবার জন্য হ'ত ) আমরা এই রকম ভাবে প্রকাশ করতে পারি—

$$c—M—c$$

পরের যুগের বিনিময়কে (যখন বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে হতে লাগল ) আমরা এই রকম ভাবে লিখতে পারি—

$$M—c—M'$$

∴ বাড়তি মূল্য $= S = M' — M$

২। **যান্ত্রিক সংগঠন**—

মনে কর, মোট পুঁজি ( যা ব্যবসায়ে খাটছে ) $= M$

এই মোট পুঁজির একটা অংশ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে খাটছে। তাকে আমরা বলছি —C

এবং যে অংশটা শ্রমশক্তির মূল্য বাবদ খরচ করা হ'চ্ছে পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে, তাকে আমরা বলব—V

তা'হলে $M = C + V$

যন্ত্রপাতির তুলনায় যত মজুর খাটছে, সেটা বুঝতে পারব—C এবং V অনুপাত দিয়ে, অর্থাৎ $\frac{C}{V}$ দিয়ে।

$\frac{C}{V}$ ই হ'চ্ছে যান্ত্রিক সংগঠনের পরিমাপ।

৩। **বাড়তি মূল্যের হার**—

(ক) বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করতে গেলে পুঁজিবাদীকে তার পুঁজি (M) দিয়ে শ্রমশক্তি (V), কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

( C ) কিনতে হবে। কারখানায় উৎপাদন চালু করবার পর Cর পরিমাণ ঠিকই থাকবে ; শুধু V নিজের মূল্য এবং বাড়তি মূল্য S সৃষ্টি করবে। সুতরাং উৎপাদনের ভেতর দিয়ে V বেড়ে গিয়ে V+S এর সমান হবে।

সুতরাং বাড়তি মূল্যের জন্মের সূত্র আমরা এই রকম ভাবে লিখতে পারি—

$$M = \left\{ \begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & C \\ + & & + \\ V & \longrightarrow & (V+S) \end{array} \right\} M'$$

(খ) বাড়তি মূল্যের হারকে আমরা বলব—$S'$

মনে কর, V পরিমাণ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে S পরিমাণ বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হল, সুতরাং $S' = \frac{S}{V}$

(গ) বাড়তি মূল্যের হার বার করবার আর একটা উপায় হচ্ছে—মোট কাজের সময়টাকে আবশ্যকীয় শ্রমসময় ও বাড়তি শ্রমসময় দিয়ে ভাগ করা।

মনে কর, মোট সময় $= t$

আবশ্যকীয় শ্রমসময় $= n$

বাড়তি শ্রমসময় $= r$

সুতরাং $t = n + r$

তাহলে $S' = \frac{t}{n}$

এটা থেকে $S'$ বাড়াবার একটা কৌশল আমরা বুঝতে পারি—

$S'$ বাড়বে যদি n ঠিক রেখে t বাড়ে ;

অথবা, যদি t ঠিক রেখে n কমে ;

এবং যদি r এবং n দুটোই কমে, কিন্তু n কমবার হার r কমবার হারের চাইতে বেশী দ্রুত হয়।

৪। **মুনাফার হার—**

মুনাফার হারকে আমরা বলব $P'$

(ক) পুঁজিবাদী মুনাফার হার বার করবার সময় বাড়তি মূল্যের সঙ্গে শুধু শ্রমশক্তি বাবদ ব্যয় অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনা করে না, মোট পুঁজির সঙ্গে তুলনা করে।

সুতরাং যদি M পরিমাণ মোট পুঁজিতে S পরিমাণ বাড়তি মূল্য তৈরী হয়, তাহলে মুনাফার হার হবে—

$$P' = \frac{S}{M}$$

$$= \frac{S}{C+V} \cdots [\text{ যেহেতু } M = C + V ]$$

(খ) $P'$ নির্ভর করে $S'$ ও $\frac{C}{V}$ এর উপর ;

কারণ, $P' = \frac{S}{C+V}$ এবং $S' = \frac{S}{V}$ ; অথবা $S = S'V$

সুতরাং $P' = \frac{S'V}{C+V}$ ......[ S এর জায়গায় $S'V$ লিখে ]

$$= \frac{S}{\frac{C}{V}+1}$$ [ উপরে ও নীচে V দিয়ে ভাগ করে ]

স্মুতরাং $P'$ নির্ভর করেছে $S'$ ও $\frac{C}{V}$র উপর

$$\therefore \quad P' = f\left(S', \frac{C}{V}\right)$$

অর্থাৎ, যদি $\frac{C}{V}$ ঠিক থেকে S বাড়ে তাহলে $P'$ও বাড়ে।

যদি $S'$ ঠিক থেকে $\frac{C}{V}$ বাড়ে তাহলে $P'$ কমে।

অর্থাৎ, বাড়তি মূল্যের হার যত বাড়বে মুনাফার হার তত বাড়বে।

৫। **ব্যবসা-সঙ্কট—**

মনে কর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন-যন্ত্র—উৎপাদন বিভাগ I

খাবার-দাবার, কাপড়, জুতা ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য—উৎপাদন বিভাগ II

I বিভাগে মোট পুঁজি খাটছে M এবং বাড়তি মূল্য তৈরী হচ্ছে S, স্মুতরাং I বিভাগে মোট যত মূল্য তৈরী হ'ল তা হচ্ছে—

$$= M + S$$

$$= C + V + S \text{ যেহেতু } [\, M = C + V \,]$$

আমরা I বিভাগের মোট উৎপাদিত মূল্যকে বলব

$$= I(C + V + S)$$

এইরূপ, II বিভাগেরও মোট উৎপাদিত মূল্য হবে

$$= II(C + V + S)$$

এখন মনে কর, উভয় বিভাগেরই যে বাড়তি মূল্যটা তৈরী হয়, তার কিছুটা পুঁজিবাদী নিজে খরচ করে, কিছু ব্যবসায়ে খাটায়। ব্যবসায়ে যতটা খাটায় তা আবার কিছুটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে মজুরদের দেয়, কিছু অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে যন্ত্রপাতি কিনতে ব্যয় করে। এই কথা I ও II দু'বিভাগের পক্ষেই খাটে। পুঁজিবাদী বাড়তি মূল্যের যে অংশটা নিজের ব্যবহারের জন্য খরচ করে তাকে আমরা বলব "a", যে অংশটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে তাকে বলব "l" এবং যে অংশটা অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে তাকে বলব "k". সুতরাং বাড়তি মূল্য (S) এই রকম ভাবে ভাগ হয়ে যায়—

বাড়তি মূল্য (S)

পুঁজিবাদীর নিজের ব্যয়িত অংশ = a

ব্যবসায়ে খাটান অংশ

অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে = k

পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে = l

সুতরাং, $S = a + (k + l)$.

সুতরাং, I বিভাগে যত মূল্য তৈরী হ'ল তার মোট মূল্য—

$I(C+V+S) = [C+V+\{a+(k+l)\}]\cdots$

····[S-এর জায়গায় $a+(k+l)$ বসিয়ে

$= I(C+V+a+k+l)$

তেমনি II বিভাগের মোট মূল্য হবে—

$= II(C+V+S) = II[C+V+\{a+(k+I)\}]$

$= II(C+V+a+k+l)$

I বিভাগের এই মোট মূল্যের ভেতর যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণ, নূতন যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য লাগছে—$(C+k)$

অর্থাৎ I বিভাগের মোট যত মূল্য তৈরী হচ্ছে, তার $(C+k)$ পরিমাণ ঐ বিভাগের লোকদের কাছেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বাকী থাকছে—$(V+a+l)$ পরিমাণ মূল্য। I বিভাগের এই পরিমাণ II বিভাগের কাছে বিক্রি করতে হবে।

II বিভাগের যত মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে তার ভেতর $(V+a+l)$ পরিমাণ মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য ঐ বিভাগের লোকদের কাছেই বিক্রি হ'য়ে যাবে। কারণ V হচ্ছে পুরাণো শ্রমিকদের আয় এবং l হচ্ছে নূতন শ্রমিকদের আয়। সুতরাং, শ্রমিকরা এই আয় দিয়ে ব্যবহারিক দ্রব্য কিনবে (আমরা ধ'রে নিচ্ছি শ্রমিকদের যা আয় তা থেকে কিছু বাঁচাতে পারে না, সবটাই ব্যবহারিক দ্রব্যে খরচ হয়)। সুতরাং এই পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য

II বিভাগের মজুরদের কাছেই বিক্রি হয়ে যাবে। II বিভাগের পুঁজিপতিরাও কিছুটা পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য কিনবে। আমরা আগে তার পরিমাণ ধরেছি "a", সুতরাং মোট ঐ বিভাগেই ( V+a+l ) পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি হয়ে যাবে। II বিভাগের উৎপাদিত পণ্যের আর বাকী থাকে (C+k) পরিমাণ মূল্য। এইটা তারা I এর লোকদের কাছে বিক্রি করতে পারে।

সুতরাং I বিভাগ II বিভাগের কাছে I (V+a+l) পরিমাণ যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে চাইবে এবং II বিভাগ I বিভাগের কাছে II (C+k) পরিমাণ মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি করতে চাইবে। সুতরাং I-এর ও II-এর সব পণ্য বিক্রি করতে হ'লে I(V+a+l)=II(C+k) হওয়া দরকার। যদি এই দুইটা সংখ্যা সমান না হয় তা হলেই পণ্য অবিক্রীত থেকে যাবে এবং ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় যে যার মতন উৎপাদন করে বলে এই দুইটি সংখ্যা বরাবর সমান রাখা খুব কষ্টকর।

সমাপ্ত